# আমেরিকার আগ্রাসন

## মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকৌশল

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ

# আমেরিকার আগ্রাসন
# মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকৌশল

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ

www.pathagar.com

**আমেরিকার আগ্রাসন ঃ মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকৌশল**
প্রফেসর খুরশিদ আহমদ
امر یکی عزائم : مقابلے کی حکمت عملی এর বাংলা অনুবাদ
অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ হাসান রহমতী

**প্রকাশকাল**
রবীউল আওয়াল ১৪২৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০
মে ২০০৩

**প্রকাশক**
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
ও জেনারেল সেক্রেটারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ
৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি-২৭ (পুরাতন)
৩য় তলা, ঢাকা-১২০৯, ফোন ঃ ৯১৩১৭০৫

**কম্পিউটার কম্পোজ**
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরের পুল (১ম গলি)
ঢাকা-১০০০

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
মোঃ রওশন আলী
আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

**মূল্য ঃ ১০.০০**

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

আমেরিকা বিশ্বায়নের যে ফর্মূলা নিয়ে এগিয়ে চলছে তাতে ইসলাম ধর্মকে প্রধানতম প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কারণ ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিগত পৌণে শতক থেকে পরিচালিত ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রভাব। ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এবং এদের পরিচালক-বৃন্দের মার্কিন তোষণ নীতির পরও আমেরিকার চোখে মুসলমানরা কাঁটার মতো বিঁধছে। ইহুদি অর্থ ও ইহুদি মিডিয়ার অক্টোপাসে বাঁধা আমেরিকার গণতন্ত্র তাদের নিজেদের দেশের জনগণের কাছে প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। বিগত নির্বাচনে জর্জ বুশের জয়লাভ এরি একটি ধারা মাত্র। এটা গোঁড়া ইহুদি মৌলবাদের সাথে গোঁড়া খৃষ্টীয় মৌলবাদের একটি যোগসাজশ। এই দুই গোঁড়া মৌলবাদী গোষ্ঠী ইসলামের মতো একটি উদার মানবিক আদর্শকে বরদাশত করতে পারছে না। সারা বিশ্বজনমতকে কানাকড়ি গুরুত্ব না দিয়ে আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ও দখল সবে সূচনা মাত্র। এখনো তাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে।

সারা বিশ্বে এখন আমেরিকা একক পরাশক্তি। তার বিরুদ্ধে কারোর মাথা তোলার অধিকার ও ক্ষমতা নেই। ইরাক প্রসংগে বিশ্বজনমত ও জাতিসংঘ প্রস্তাব উপেক্ষা করে তার দুঃসাহস আরো বেড়ে গেছে। ইসলাম, মুসলমান, সত্য-ন্যায় ও মানবতার বিরুদ্ধে নতুন নতুন ধ্বংসশক্তি ও মারণাস্ত্র নিয়ে সে এগিয়ে আসবে। ঈমানী বলে বলীয়ান মুসলমানদেরই এর মোকাবিলা করতে হবে। ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা প্রফেসর খুরশিদ আহমদের একটি সাময়িক রচনা এব্যাপারে মুসলমানদের সামনে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকা তুলে ধরেছে বলে আমরা মনে করি। এই সাথে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দরদী মুসলিম লেখক জনাব হারুনুর রশীদ লিখিত আমেরিকার বিগত ৬০ বছরের জুলুম ও আগ্রাসনের একটি ফিরিস্তিও যুক্ত করে দিলাম। আর জর্জ ডবলিউ বুশের বর্তমান অবস্থান ও মনোভাব সম্পর্কিত একটি সাংবাদিক রিপোর্টও এর সাথে যুক্ত করলাম। এগুলি সব বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমেরিকা, তার প্রপাগাণ্ডা ও আগ্রাসনের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পাঠককে সাহায্য করবে বলে মনে করি।

www.pathagar.com

মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এবং বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের আমেরিকা এবং এ ধরনের অন্যান্য আগ্রাসী শক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং নিজেদের ঈমান ও আমলকে বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

বিগত অর্ধ শতক ধরে বিশ্বব্যাপী মার্কিন আগ্রাসন ও বর্বরতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

## কে থামাবে মার্কিনী বন্য বরাহদের এই তাণ্ডব?

"কিল দেম অল্" (এদের সকলকে হত্যা করো)। তখন কোরিয়ার যুদ্ধ চলছে। ১৯৫০ সালের জুলাই মাস। ৪০০ জন বেসামরিক উদ্বাস্তু, যার অধিকাংশই নারী ও শিশু, আশ্রয় নিয়েছিলো দক্ষিণ কোরিয়ার এক রেলসেতুর নিচে। মার্কিন কমান্ডারের উপরোক্ত নির্দেশ মোতাবেক যুদ্ধজাহাজ থেকে বেপরোয়া গোলা নিক্ষেপ করা হলে এই ৪০০ জন নারী-পুরুষ-শিশুর সকলেই নিহত হয়। ৮২ জন গ্রামবাসী ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো একটি ছোট উপাসনালয়ে। তাদের সবাইকেও একইভাবে হত্যা করা হয় মার্কিন কমান্ডারের নির্দেশে। হত্যাকাণ্ডে মার্কিনীদের মতো এতো আনন্দ এ যুগে আর কেউ কখনো পেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

দেশে দেশে হামলা ও হত্যাকাণ্ডের অজুহাত হিসেবে মার্কিনীরা বলে যে, তারা নাকি এসব করছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করারই মহৎ উদ্দেশ্যে। গত প্রায় ৬০ বছরে মার্কিনীরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে যেসব ভয়ংকর দানবীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

(১) ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তারা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি নামক দু'টি শহরকে আণবিক বোমা মেরে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ দু'টি আণবিক বোমা হামলার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ও ক্রমান্বয়ে প্রায় ২০ লাখ বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি ঘটে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মার্কিনীরা ব্যতীত আর কেউই কখনো আণবিক বোমা হামলার বর্বরতা প্রদর্শন করেনি।

(২) ১৯৪৫-৫৩ সালব্যাপী অনুষ্ঠিত কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী জাতিসংঘ বাহিনীর নামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় ২৫ লাখ কোরীয়কে হত্যা করে। তারা এমন বর্বরোচিত বোমা হামলা চালিয়েছিলো যে, উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়াংয়ের একটি দালানও তখন দণ্ডায়মান ছিলো না এবং সারা দেশে অক্ষত ছিলো না একটি শিল্পকারখানা বা প্রতিষ্ঠানও।

www.pathagar.com

(৩) ১৯৪৯-৫৩ সালে মার্কিনীরা গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে আলবেনিয়ার সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে।

(৪) ১৯৪৭-৫০ সময়ে গ্রীসকে তারা পরিণত করে তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে।

(৫) ১৯৪৮-৫৬ সময়ে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশসমূহে পরিচালিত অপারেশন ইসপ্লিন্টার ফ্যাক্টর-এর মাধ্যমে মার্কিনীরা এক চেকোশ্লোভাকিয়াতেই কম্যুনিস্ট পার্টির ১,৬৯,০০০ সদস্যকে গ্রেফতার করায়। তারা একই কাণ্ড ঘটায় হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে। এইসব অপারেশনে নিহত হয় ৫ লাখেরও বেশী মানুষ।

(৬) ১৯৫৩-৫৪ সালে ল্যাটিন আমেরিকার গুয়াতেমালার জ্যাকবো আরবেঞ্জ-এর নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে একটি বশংবদ সামরিক সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। এই কাণ্ডেও প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়।

(৭) ১৯৫৭-৫৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি মোতাবেক মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরায়লী বাহিনী গাজা স্ট্রীপ ও মিসরের সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয়।

(৮) ১৯৫৩-৬৪ সময়ে সিআইএ বৃটিশ গায়ানায় আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন তৈরী করে এবং ১৯৬৪ সালে ছেদি জগান সরকারের পতন ঘটায়। এ ঘটনায়ও বহু লোক নিহত হয়।

(৯) ১৯৫০-৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনীরা নাপাম বোমা, জীবাণু বোমা ইত্যাদি ব্যাপক বিধ্বংসী ও নরঘাতী অস্ত্র বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করে। ক্রিস্টোফার হিচেনস তার ২০০১ সালে প্রকাশিত 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এই যুদ্ধে মার্কিনীরা ৪৩ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করে।

(১০) ১৯৫৮ সালে লেবাননের সংখ্যালঘু খৃস্টানদের অনুরোধে ১৪,০০০ মার্কিন সৈন্য লেবাননে অবতরণ করে এবং প্রায় ৫০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

(১১) ১৯৫৫-৭৩ সময়ে অনুষ্ঠিত কম্বোডিয়ার যুদ্ধে এবং ১৯৫৭-৭৩-এর লাওসের যুদ্ধে আরও অন্তত ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করে মার্কিন বাহিনী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একমাত্র মার্কিনীরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ কখনো এরূপ ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করেনি।

(১২) ১৯৫৯ সালে মার্কিন সেনাবাহিনী হামলা চালায় হাইতিতে।

www.pathagar.com

(১৩) ১৯৬৪ সালে সিআইএ হত্যা করায় কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে। এই চক্রান্তের বিরোধিতা করায় তারা জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশোল্ডকেও বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যা করে।

(১৪) ১৯৬০ সালের দিকে মার্কিন বিমান ও নৌবাহিনী ডোমিনিকান রিপাবলিকে হামলা চালায় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দেশটিকে দখল করে রাখে।

(১৫) ১৯৫৯ সালে ফিডেল ক্যাস্ট্রো ও চেগুয়েভারার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় কিউবা বিপ্লব। ক্ষিপ্ত মার্কিনীরা এই দেশটির ওপর ১৯৫৯-৮০ সময়ে বারংবার প্রয়োগ করে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র। ফলে লাখ লাখ মানুষ ও পশু ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায় কিউবার ক্ষেতের ফসল।

(১৬) চিলির তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে চিলির মার্কিন মালিকানাধীন মাইনিং কোম্পানী জাতীয়করণ করলে ক্ষিপ্ত মার্কিনীরা ১৯৭৩ সালে সিআইএ-র মাধ্যমে আলেন্দেকে হত্যা করায় এবং নরদানব জেনারেল পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসায়। প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তায় পিনোচেট হত্যা করেন ৫০,০০০ বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদীকে।

(১৭) ১৯৬৪-৭৩ সালে সিআইএ বলিভিয়া ও পানামায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং কোস্টারিকার জোসে ফিগুয়ার্স-এর সরকারকে গদিচ্যুত করে।

(১৮) ১৯৭৯-৮১ সময়ে গ্রানাডায় আগ্রাসন চালিয়ে মার্কিন বাহিনী ঐ দেশের বামপন্থী সরকার প্রধান মরিস বিশপসহ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে।

(১৯) ১৯৮০-র দশকে মার্কিনীরা নিকারাগুয়ায় হামলা চালিয়ে প্রায় ১৫ হাজার মানুষকে হত্যা করে।

(২০) ১৯৮৯ সালে একইভাবে মার্কিনীরা হত্যা করে পানামার ৭,০০০ থেকে ৮,০০০ মানুষকে।

(২১) ১৯৮১-৮৯ সময়ে তারা বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হামলা চালায় লিবিয়ায়। মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা করার জন্য হামলা চালানো হলে নিহত হয় তাঁর দু'বছর বয়সী শিশু কন্যা। ১৯৮৬-৮৯ সময়ে মার্কিন হামলায় প্রায় এক হাজার লিবীয় নিহত হয়।

(২২) ১৯৯১ সালের ১৬ জানুয়ারী থেকে মার্কিনীরা বৃটেনের সহায়তায় ইরাকে পরিচালনা করে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম'। ৪৪ দিনব্যাপী এই সামরিক অভিযানে ব্যাপক বোমাবর্ষণ ছাড়াও তারা নিক্ষেপ করে ৯৮টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলা ও তৎপরবর্তী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রায় ৩০ লাখ ইরাকীর মৃত্যু ঘটে।

www.pathagar.com

একদা সচ্ছল এই ইরাকের পনের লক্ষাধিক শিশুই শুধু মৃত্যুবরণ করে দুধ, ওষুধ ও পথ্যের অভাবে।

(২৩) ১৯৬০ সাল থেকে এ যাবত কলাম্বিয়ায় মাদক চোরাচালান বন্ধ করার নামে মার্কিনীরা হত্যা করে আনুমানিক ৬৭ হাজার কলাম্বিয়ানকে।

(২৪) ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে কসভোয় বিমান হামলা চালিয়ে মার্কিনীরা ৩,০০০-এরও বেশী মানুষকে হত্যা করে।

(২৫) এর আগে ১৯৯৩ সালে মার্কিনীরা হাইতিতে হামলা চালিয়ে শাসক জেনারেল সিড্রাসকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। একই বছর মার্কিনীরা সোমালিয়ায় শুরু করে 'অপারেশন রোস্টার হোপ' এবং হত্যা করে দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশটির প্রায় ২০ হাজার ভুখানাঙ্গা মানুষকে।

(২৬) ১৯৯২-৯৩ সালে মার্কিনীদের সক্রিয় সহযোগিতায় খৃস্টান ও ইহুদীরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের ওপর নারকীয় হামলা চালায় এবং অন্তত ২৫,০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।

(২৭) ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন মদদপুষ্ট ইহুদিরা হেবরনের ইব্রাহিম মসজিদে হামলা চালিয়ে ফজরের নামায আদায়রত শতাধিক মুসলমানকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে।

(২৮) ১৯৯৮ সালের ৭ আগস্ট কেনিয়া ও তানজানিয়ায় বোমা হামলা চালিয়ে ওরা হত্যা করে ২২৫ জন নিরীহ নাগরিককে এবং আহত করে প্রায় ৪,০০০ মানুষকে।

(২৯) ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট মার্কিনীরা একই সঙ্গে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আফগানিস্তান ও সুদানে, যার ফলে কয়েক হাজার ব্যক্তি নিহত হয়। সুদানের আল-শিফা নামক বৃহত্তম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটিও তারা ধূলিসাৎ করে দেয়।

(৩০) ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর মার্কিনীরা আফগানিস্তানে দ্বিতীয় দফা হামলা শুরু করে। সি-১৩০ হেলিকপ্টার গানশিপ ও বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে বেপরোয়াভাবে নিক্ষেপ করা হয় ক্লাস্টার বোমা, বাংকার ব্লাস্টার বোমা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক বিধ্বংসী বোমা। এইসব হামলায় তিন লক্ষাধিক আফগান মুসলমান নিহত হয়।

(৩১) ২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিনীরা ইরাকে হামলা চালায় এবং ১০ এপ্রিল দেশটি দখল করে নেয়।

www.pathagar.com

এছাড়াও ১৯৪৫ সাল থেকে এযাবত পৃথিবীতে যতো সামরিক সংঘর্ষ, আঞ্চলিক যুদ্ধ, গণহত্যা, ধ্বংসলীলা ও স্নায়ুযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে, দেখা গেছে যে, তার প্রায় প্রত্যেকটির সংগেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিআইএ-কেজিবি-পেন্টাগন জড়িত ছিলোই এবং এখনো আছে। প্রসঙ্গত ১৯৫৩ সালে ইরাকের ডাঃ মোসাদ্দেকের সরকারকে উৎখাত, ১৯৫৫ সালে নিকারাগুয়ার ডিক্টেটর সামোজাকে কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট জোসে ফিগুয়ার্স-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার, ১৯৭২-৭৫ সালে ইরাক-ইরানের কুর্দিদের অস্ত্র ও উস্কানিদান, ১৯৭১ সালে লাখ লাখ বাঙালীকে হত্যাকারী হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে সমর্থনদান, ২০০১ সালে চীনে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের অনুপ্রবেশ ঘটানো, ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ডাঃ শোয়েকার্নোকে উৎখাত করে জেনারেল সুহার্তোকে ক্ষমতায় আনয়ন, ১৯৭০ সালে চিলির জেনারেল স্নাইডারকে গুপ্তহত্যা, ১৯৭৪ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে উৎখাত এবং তুরস্ককে লেলিয়ে দিয়ে কয়েক হাজার সাইপ্রিয়টকে হত্যা, ১৯৯০ সালে পানামার প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল নরিয়েগাকে সশরীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে আসা ও ৪০ বছরের সাজাদান, ১৯৮২ সালে ইসরায়েলকে লেলিয়ে দিয়ে ১৭ হাজার লেবাননী নাগরিককে হত্যা, ১৯৮২-৯০ সালে আফ্রিকার পিনোচেট বলে কুখ্যাত শাদ-এর স্বৈরশাসক হিসেনি হাব্রীকে ৪০ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যায় মদদদান, হাইতির স্বৈরশাসক জাঁ ক্লদ দ্যুভেলিয়ারকে ক্ষমতায় বসানো ও ১৯৮৬ সালে উৎখাত, একই বছর (১৯৮৬) লিবীয় টহল বোটে হামলা চালিয়ে ৭২ জনকে হত্যাসহ অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষ মার্কিন মদদে দ্যুভেলিয়ার হত্যা করেন তার বিরোধী প্রায় ৬০ হাজার মানুষকে।

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে মোতায়েন করে রেখেছে তাদের অসংখ্য সেনাবাহিনী ও সামরিক ঘাঁটি। এখানে তার কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো।

(১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই জাপানে মোতায়েন আছে ১৮ হাজার মার্কিন সৈন্য। এছাড়াও তাদেরকে পুষতে হচ্ছে ৮৪টি মার্কিন যুদ্ধবিমান।

(২) ওকিনাওয়ায় রয়েছে মার্কিন সপ্তম নৌবহর ও ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য।

(৩) ১৯৫০-এর দশক থেকেই দক্ষিণ কোরিয়ায় মোতায়েন আছে ২৯,১৫০ জন মার্কিন সৈন্য।

www.pathagar.com

(৪) প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়াম, দিয়াগো গার্সিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় আছে বিভিন্ন আকৃতির মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি।

(৫) থাইল্যান্ডে মোতায়েন আছে একটি মার্কিন সেনা কন্টিনজেন্ট।

(৬) ফিলিপিন্সেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে এবং তারা সরকারী সৈন্যের সংগে মিলে লড়াই করছে আবূ সায়াফ ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে।

(৭) আফগানিস্তানে মোতায়েন আছে ৭,০০০ মার্কিন সৈন্য এবং তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত তালেবানদের নির্মূল করার জন্য।

(৮) 'অপারেশন এনডেয়ারিং ফ্রিডম' নামের ইসলামী মৌলবাদ বিরোধী অভিযানে তারা ব্যবহার করছে উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরগিজিয়ার মাটি ও আকাশ।

(৯) গুয়ানতানামোতে মোতায়েন আছে ২,২০০ মার্কিন সৈন্য।

(১০) কলাম্বিয়া ও হন্ডুরাসে অপারেশন চালাচ্ছে প্রায় ৪০০ মার্কিন স্থল ও নৌ-বিমান সেনা।

(১১) বারমুডা, আইসল্যান্ড ও অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জের গোপন ঘাঁটিতে রয়েছে ১,৭০০ মার্কিন সৈন্য।

(১২) স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপে অবস্থান করছে ৯৮ হাজার মার্কিন সৈন্য।

(১৩) জার্মানীতে আছে ৫৬ হাজার মার্কিন সৈন্য ও ৬০টি যুদ্ধবিমান।

(১৪) ইটালিতে রয়েছে ১২ হাজার ৪০০ মার্কিন সৈন্য।

(১৫) বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন ও গ্রীস অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ৮ হাজার ২৮৩ জন মার্কিন সৈন্য।

(১৬) ১৯৯২ সাল থেকে বলকান অঞ্চলের বসনিয়ায় রয়েছে ২,০০০ এবং কসভোয় রয়েছে ৫,০০০ মার্কিন সৈন্য। এছাড়াও এখানে রয়েছে মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন ৩৪,০০০ ন্যাটো পরিচালিত সৈন্য।

(১৭). হাঙ্গেরী ও মেসিডোনিয়ায় অবস্থান করছে ৮৪০ জন মার্কিন সৈন্য।

(১৮) বর্তমানে ১৫টি মুসলিম দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এই দেশগুলো হচ্ছে সউদী আরব, কুয়েত, কাতার, জর্ডান, আরব আমিরাত, মিসর, জিবুতি, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান। আর ইরাক তো তারা দখলই করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

(১৯) ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন আছে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ও ২০০০ মেরিন সেনা। ভূমধ্যসাগর এখন কার্যত মার্কিনীদেরই দখলে।

(২০) প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে নিত্য টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ৪টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ, পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম ১০টি সাবমেরিন এবং ডেস্ট্রয়ারসহ আরো ৫৫টি বিভিন্ন ধরনের রণতরী।

২০০৩ অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাজেট হচ্ছে ২১২৮ বিলিয়ন ডলার এবং এর মধ্যে সামরিক খাতে বরাদ্দ হচ্ছে ৩৭৯ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ ২২,৭৪,০০০ কোটি টাকা। এই বিপুল টাকার সিংহভাগ জর্জ বুশ খরচ করবেন তার ভাষায় "শয়তানের দোসর" দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রসমূহকে দমন, সন্ত্রাসের উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন দেশের জনগণের মুক্তির জন্য। ক'মাস আগেও জর্জ ডব্লু বুশের দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের তালিকায় ছিলো তিনটি দেশ- ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া। এরপর ওই তালিকায় যুক্ত হয় সিরিয়া। এখন কিউবা ও লিবিয়াকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, কোন দেশ সন্ত্রাস করতে পারে কিংবা গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ করতে পারে বলে মনে করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে হামলা চালিয়ে দখলদারি প্রতিষ্ঠার অধিকার রাখে। বলা বাহুল্য, এই অধিকার মার্কিনীদের কেউই দেয়নি, তারা গায়ের জোরেই এই অধিকারের অধিকারী হয়ে বসেছে।

এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেরই ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (Mit)-এর অধ্যাপক নোয়াম চামস্কি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র Rogue State হচ্ছে সেইসব রাষ্ট্র যারা র‍্যাডিক্যাল জাতীয়তাবাদের অনুসারী। কোন অপরাধ করুক বা না করুক, যেসব রাষ্ট্র মার্কিনীদের হুকুমকে আগ্রাহ্য করে তারাই দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। অথচ চামস্কির মতে, বর্তমান বিশ্বে আসল দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই। কারণ তারা এযাবত আণবিক বোমা ও জীবাণু বোমাসহ যতো মানববিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যতো শহর, জনপদ ধ্বংস করেছে, যতো নরহত্যা করেছে, যতো মানুষকে পঙ্গু, স্বজনহারা ও এতিম করেছে, যতো দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করেছে, মানব সভ্যতা ও মূল্যবোধের ওপর যতো আঘাত হেনেছে এবং হেনে চলেছে, গত ৬০ বছরে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র তার এক হাজার ভাগের এক ভাগও করেনি।

সন্দেহ নেই, মার্কিনীদের আশু লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের জেগে ওঠার সম্ভাবনাকে দাবিয়ে দেয়া এবং বিশ্বের জ্বালানি সম্পদের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মার্কিন সরকারের মুখপাত্ররা এটাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখতে চায় না এখন থেকে পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র বা শক্তির অবস্থান থাকুক, যারা সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সামান্যতম চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। অন্য কথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়, এখন থেকে গোটা দুনিয়াই হবে মার্কিন স্বার্থেরই নিঃশর্ত আজ্ঞাবহ। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য তারা গোটা দুনিয়ার জনমতকেও পদাঘাতে নস্যাৎ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর জাতিসংঘকেও তারা ইতোমধ্যেই দাবিয়ে দিয়েছে তাদের মিলিটারী স্পর্ধার নিচে। জাতিসংঘকে এখন থাকতে হলে থাকতে হবে মার্কিন যথেচ্ছারের সেবাদাস প্রতিষ্ঠান হিসেবে, অন্যথায় মার্কিনীরা জাতিসংঘকেও নস্যাৎ করে দিবে, যেভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছিলো প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী লীগ অব নেশনসকে।

সাম্প্রতিক ইরাক হামলার সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণী তাদের আচরণ ও ভূমিকার মাধ্যমে এটা বেশ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যে বর্তমান বিশ্বের অর্ধশক্তিমান দেশ-এই সত্য তারা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন এবং তাই মার্কিন স্পর্ধা-আধিপত্য মেনে নিতেও তারা কমবেশী প্রস্তুত আছেন। এমতাবস্থায় বাদবাকি বিশ্বের সামনে পথ আছে দু'টি ঃ

(১) মার্কিন আধিপত্য-স্পর্ধা ও হুকুম-নির্দেশ অম্লান বদনে মেনে নিতে থাকা, স্ব স্ব সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে মার্কিনীদের নির্দেশ মোতাবেক নিম্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কখনো কোন বিষয়ে মার্কিনীদের সমকক্ষতা অর্জনের স্বপ্ন না দেখা। প্রশাসন, সমাজব্যবস্থা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আভ্যন্তরীণ নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মার্কিনীদের আদেশ-নির্দেশ সদাসর্বদা মেনে চলা।

(২) মার্কিনীরা গোটা দুনিয়ার ওপর তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলার আগেই আত্মরক্ষার স্বার্থে নিজেরা জোটবদ্ধ হওয়া এবং মার্কিনীদের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী ও ফ্রান্সও যদি জোটবদ্ধ হয় তাহলেও মার্কিনীদের সাধ্য থাকে না বিশ্বে যা খুশি তাই করে বেড়ানোর। কিন্তু এরূপ জোট গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ তো এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আর গোটা বিশ্বের ওপর মার্কিনীরা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করুক আর নাই করুক, মুসলিম বিশ্বের উত্থান বা বিকাশের সম্ভাবনাকে যে তারা দাবিয়ে দেবেই, এটা অন্তত সুনিশ্চিত। অবশ্য অধিকাংশ মুসলিম দেশের শাসক শ্রেণী তো

www.pathagar.com

ইতোমধ্যেই তাদের গদি ও ভোগ-বিলাসের স্বার্থে মার্কিন সেবাদাসত্ব কম-বেশী মেনেই নিয়েছেন। অন্যদিকে, যারা নিজেদের ইসলামপন্থী বা ইসলামের যথার্থ অনুসারী বা ইসলাম বিষয়ে সুবিজ্ঞ বলে মনে করেন, তারাও কোন ধারাবাহিক বাস্তব উদ্যোগের বদলে কেরামতি সমাধানের আশায়ই বোধ হয় নিশ্চিন্তে বসে আছেন, যেমন তারা বসেছিলেন গত প্রায় এক হাজার বছর।

আর যারা মুসলমান নামধারী অথচ ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ, তাদের তো মার্কিন আধিপত্য কায়েম হলেই পোয়াবারো।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার ভূমিপুত্র রেড ইন্ডিয়ানদের বর্বরভাবে উচ্ছেদ ও পাইকারী হত্যার মাধমেই জর্জ ডব্লু বুশদের পূর্বপুরুষরা আমেরিকায় কায়েম করেছিলেন তাদের দখলদারি রাষ্ট্র। তারাই অহল্যা আফ্রিকার ভেতর থেকে লাখ লাখ স্বাস্থ্যবান তরুণ-তরুণীকে গলায় দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়ে বানিয়েছিলেন তাদের ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাসদেরই একজন ছিলেন বুশের পরম দোসর কলিন পাওয়েলের পূর্বপুরুষও। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে এই মার্কিনীরাই পরিণত করেছিলো গৃহপালিত পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর জীবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়ও এই মার্কিনীরাই নররক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলা আমেরিকা জুড়ে। একমাত্র মার্কিনীরাই আণবিক বোমা, নাপাম বোমা, জীবাণু বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে গত ৬০ বছরে ৬০ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। তারাই এখন ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, স্বকীয়তা ও সমৃদ্ধি।

কেউ না থামালে মার্কিনীদের এই হিংস্র উন্মত্ত বন্য বরাহসুলভ বর্বরতা তো আপনা আপনিই থামবে না, অন্তত আপাতত তো নয়ই।

কিন্তু কে থামাবে তাদের তাণ্ডব?

হারুনুর রশিদ

[দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে]

## জর্জ বুশের ধর্মযুদ্ধ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলিউ বুশ মনে করেন, ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুশেডে নেতৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বরই তাকে মনোনীত করেছেন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরপরই প্রেসিডেন্ট বুশ তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় একে 'ক্রুসেড' (ধর্মযুদ্ধ) হিসেবে অভিহিত করেন। এটি বরং ছিলো

www.pathagar.com

একটি কূটনৈতিক উক্তি এবং মার্কিন প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে তা নাকচ করে দিয়ে বলে, 'একথা মুখ ফসকে' বেরিয়ে গেছে। পরবর্তীতে বুশ কিছু সময় ইসলামকে 'শান্তির ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সে সময় জোর দিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। ব্যক্তি বুশ ও তার বক্তব্যকে এইভাবে চিত্রিত করা যায় যে, "বক্তা বুশ যেমন, ব্যক্তি বুশ ঠিক অন্যরকম।" যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্য যে কোন প্রেসিডেন্টের চেয়ে বুশ প্রায়ই বাইবেল ও অন্যান্য খৃস্টান মতবাদ থেকে বেশি করে উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলেন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর এক ভাষণে তিনি বলেন, আমরা ভাল ও মন্দের মধ্যে লড়াইয়ে নিয়োজিত এবং আমেরিকা মন্দকে মন্দ বলেই অভিহিত করবে। বাইবেলের ভাষায়, ভাল ও মন্দ অর্থাৎ খৃস্টান ও শয়তানের মধ্যে লড়াই। অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিকাশ ঘটে এবং অন্ধকার তাকে অতিক্রম করতে পারে না। বুশ কংগ্রেসে তার ভাষণে বাইবেলের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, যুদ্ধে সব সময় মুক্তি ও শঙ্কা, ন্যায় ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান এবং আমরা জানি, ঈশ্বর এর মধ্যে নিরপেক্ষ নন। তিনি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেন।

অনানুষ্ঠানিক বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলোচনায় বুশ ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট মতবাদের উদ্ধৃতি দিতেন যেমনটি করতেন প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের পরিবর্তিত শাখার প্রতিষ্ঠাতা জন কেলভিন। বুশ বুঝতে পেরেছেন, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঈশ্বর আমেরিকা ও জর্জ ডব্লিউ বুশকে ব্যবহার করছেন। সাদার্ন ব্যাপটিস্ট কনভেনশনের সভাপতি রিচার্ড ল্যান্ড বলেন, বুশ এক সময় বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে, আমি প্রেসিডেন্ট হই, ঈশ্বর এটা চেয়েছেন। টাইম ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে বলেন, এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঈশ্বরই তাকে নির্ধারিত করেছেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জনসমর্থন সংগ্রহে ব্রতী হন। একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর বুশের ধারণা জন্মায় যে, এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনা, সকল মানুষের পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক বছর আগে বুশ অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করতেন যা তার পারিবারিক জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

খৃস্টান নেতা প্রয়াত রেভারেন্ট বিল গ্রাহামের সঙ্গে এক সপ্তাহান্তে আলোচনার পর তার মধ্যে শিষ্টাচার ফিরে আসে এবং তিনি ধর্মীয় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার মধ্যে বিল গ্রাহামের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিল

www.pathagar.com

গ্রাহামের মৃত্যুর পর তার পুত্র ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম ইভানজেলিক্যাল খৃস্টানদের নেতা হন। ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহামও পিতার মতই বুশের ঘনিষ্ঠজন হয়ে ওঠেন। তিনি প্রায়ই হোয়াইট হাউসে যেতেন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন এই ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম। তিনি ইসলামকে ঐতিহ্যগতভাবে সন্ত্রাস ও দুষ্টদের ধর্ম বলে সমালোচনা করেন।

গ্রাহাম প্রায়শই হোয়াইট হাউসে যেতেন। ২৭ মার্চ ইরাক যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ১৪১ জন ইভানজেলিক্যাল খৃস্টান নেতাকে নিয়ে হোয়াইট হাউসে এক গোপন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে জেরি ফলওয়েলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সন্ত্রাসী বলার জন্য গত বছর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে সাদার্ন ব্যাপ্টিস্ট কনভেনশনের সভাপতি জেরি ভাইনস ও সাদার্ন ব্যাপ্টিস্ট থিওলজিক্যাল সেমিনারীর সভাপতি আলবার্ট মোহলারও ছিলেন। মোহলার বলেছিলেন, ইরাকীদের বাইবেল শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ডি জেমস কেনেডিও ছিলেন, যার মন্ত্রণালয় 'খৃস্টান ধর্মের জন্য ইসলাম হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করে। হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র অবশ্য বলেন, এসব অভিমতের সঙ্গে বুশের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। ওয়াশিংটন ভিত্তিক সেন্টার ফর স্টাডি অফ ইসলাম এন্ড ডেমোক্র্যাসি-এর নির্বাহী পরিচালক রাওদান মাসমোদি বলেন, এ ধরনের অস্বীকারমূলক বক্তব্যে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সারা বিশ্বের মুসলমানরা এই ভেবে উদ্বিগ্ন যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইকে খৃস্টান মৌলবাদীরা অপহরণ করে নিয়েছে। ডালাস থিওলজিক্যাল সেমিনারীর ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ রবার্ট পাইনিও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ইরাক যুদ্ধ একটি ধর্মযুদ্ধ, "ইভানজেলিক্যাল খৃস্টানরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নন। তবে তারা আমেরিকার স্বার্থকে খৃস্টানদের স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করেন।"

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ইভানজেলিক্যাল-এর মুখপাত্র রিচ সিজিক বলেন, কতিপয় রক্ষণশীল খৃস্টানের মতে আজকের দিনে দুষ্ট সাম্রাজ্যের সমতুল্য ইসলাম কম্যুনিজমের স্থান দখল করে নিয়েছে।

[ দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মে, ২০০৩-এর সৌজন্যে ]

www.pathagar.com

# আমেরিকার আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকৌশল

## প্রফেসর খুরশীদ আহ্‌মদ

আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যেসব পলিসি গ্রহণ করে চলেছে, তাতে তার হীন চক্রান্তই সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এহেন পরিস্থিতির মুকাবিলায় আমাদের জবাবী কর্মকৌশল কি হওয়া উচিত ? কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে এবং রাসূলে করীম (স)-এর সীরাত পাকের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে যে কর্মকৌশল আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তা দু'টি ধারায় বর্ণনা করা যায় : (১) ইসতিকামাত বা অবিচলতা এবং (২) হিকমত বা কর্মকৌশল।

ইসতিকামাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা করা এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন যেরূপ আছে তার উপর পূর্ণ আস্থা, দৃঢ় বিশ্বাস এবং ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে এর ওপর অটল থাকা। স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বীয় পরিমাপ, মুসলিম জাতির প্রকৃত মর্যাদা, তার শক্তির মূল উৎস এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার মূলনীতি, মিশন ও বিশেষ কার্যকর প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনোরূপ অপোষ না করা। ইসলামকে কাটছাট করা আমাদের নীতি হতে পারে না। ইসলামের চৌহদ্দীর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকুশলতা, আনুগত্য ও ইজতিহাদ, বিশ্বস্ততা ও ঔদার্য, কর্মতৎপরতা ও আত্মদানের যে কর্মপদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) আমাদেরকে দান করেছেন তার ওপর ঈমান ও আত্মপর্যালোচনা সহকারে আমাদের অবিচল থাকতে হবে। ইসলাম আল্লাহ্‌র শাশ্বত পথনির্দেশ। এর শিক্ষাসমূহ নবীন ঊষার মতো তরতাজা, স্বচ্ছ ও আধুনিক। মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা এর গুণবৈশিষ্ট্য। কিন্তু এটা তার স্বীয় ব্যবস্থার মধ্যে তার শাশ্বত অংশ, নিজ প্রবৃত্তি বা অপরের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাকে মডার্ন বা মডারেট করা যাবে না। এ সত্যটি ভালোভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ভারসাম্য পন্থা এবং সমুদয় সমতা, উদারতা, সুসম নীতি

www.pathagar.com

তার দেয়া অধিকার ও কর্তব্যসমূহের ব্যবস্থাবলীতে পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম জাতিই একমাত্র মধ্যপন্থী জাতি এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কর্ম সব দিক দিয়ে এ জাতি মধ্যপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ধর্মসমূহের ইতিহাস পাঠ করলে আপনারা দেখতে পাবেন, আল্লাহ ও মানুষ, উপাস্য ও উপাসক এবং অল্লাহ ও পয়গাম্বরের সম্পর্ক, অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কিভাবে ঐসব ধর্মের অনুসারীরা বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছেন। ইসলাম সাম্য ও সুবিচার সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ আল্লাহ্‌র জায়গায় এবং মানুষ মানুষের জায়গায় দু'টি ভিন্ন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তাঁর খলীফা ও প্রতিনিধি। সে কোনো দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র সত্তা বা গুণাবলীতে অংশীদার নয়। এমনকি আল্লাহ্‌র নবীও সর্বোত্তম আদর্শ এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ সত্বেও আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বে কোনো প্রকার এবং কোনো পরিমাণ অংশীদারিত্বের অধিকারী নন। আর এটাই সেই মধ্যপন্থা যার উপর বিশ্বজগত প্রতিষ্ঠিত।

আবার আপনারা ধর্মসমূহের ইতিহাসে দ্বীন ও দুনিয়া, আত্মা ও জড় পদার্থ, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কেও বাড়াবাড়ি দেখতে পাবেন। কিন্তু ইসলাম এখানেও সেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ঐক্য, আত্মা ও বস্তুর সাম্য এবং দুনিয়ার পুণ্য ও আখিরাতের পুণ্যের সম্মিলন আকারে এক ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনচিন্তাই পেশ করেছে, বরং তার উপর কার্যত ব্যক্তি, সমষ্টি, ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামষ্টিক সংস্কৃতির চিত্র নির্মাণ করেও দেখিয়ে দিয়েছে।

অনুরূপভাবে আইন ও আচরণ, জাহের ও বাতেন, শব্দ ও মর্মের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অসংখ্য দৃষ্টান্ত ধর্ম ও সভ্যতা উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইসলাম এসব ক্ষেত্রেও একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং এমনভাবে অবলম্বন করেছে যার ফলে স্থিতি ও পরিবর্তনের সকল দাবিও সঠিকভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং আইন ও আইনের প্রাণসত্তা উভয়কেই একই সময় হাসিল করা মানুষের জন্য সম্ভব হয়েছে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্কের ব্যাপার হোক কিংবা পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ব্যাপার, স্বাধীনতা ও শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপার হোক কিংবা নেতৃত্ব ও পরামর্শের ব্যাপার, ইবাদতের ব্যাপার হোক কিংবা জীবনের কাজ-কারবারের ব্যাপার, ভেতরের সংশোধন হোক কিংবা কানূন ও বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন, বন্ধুত্বের ব্যাপার হোক কিংবা শত্রুতার নিয়ম-পদ্ধতি, সকল ব্যাপারেই ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। মহানবী (স) একটিমাত্র বাক্যে ইসলামের এই পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন :

www.pathagar.com

خَيْرُ الْأُمُوْرِ اَوْسَطُهَا 'সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মধ্যপন্থা'। কুরআন ও সুন্নাহ কতো সুন্দরভাবে ইসলামের এই বিশেষত্বটি ফুটিয়ে তুলেছে এবং জীবনের মেরুদণ্ড তথা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (البقرة-٢ : ١٤٣)

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হবে" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩)।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ. (الاعراف : ١٨١)

"আর আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে" (সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮১)।

আল্লাহ্‌র বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে,

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا (الفرقان- ٢٥ :٦٧)

"এবং যখন তারা ব্যয় করে, অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এ দু'য়ের ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায়" (সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৭)।

তারা পানাহার করে কিন্তু অপচয় করে না। কেননা আল্লাহ অপচয় পছন্দ করেন না।

وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الاعراف- ٧ : ٣١)

"তোমরা অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না" (সূরা আরাফ : আয়াত ৩১)।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা তাদের স্বভাবজাত বিষয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তারা না তাদের হাত গ্রীবার সাথে বেঁধে রাখে আর না তাকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দেয়।

www.pathagar.com

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا (بنى اسرائيل- ١٧ : ٢٩)

"তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৯)।

নফলের প্রতি তারা গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভারসাম্য ও ধারাবাহিকতা তাদের ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন, "আমি রোযাও রাখি আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। রাত জেগে ইবাদত করি আবার নিদ্রাও যাই। আমি আরাম করি এবং বৈবাহিক জীবনও যাপন করি।"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, ইসলাম এমন একটি ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা, যা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা, মিতাচার, ন্যায়-ইনসাফ, দাবি পূরণ, কর্তব্য পালন, আত্মীয়তা সংরক্ষণ, মানবতাকে মর্যাদাদান, বিরোধীদের উপাস্যদেরকেও গালমন্দ থেকে রক্ষা করা এবং দীনের মধ্যে কোনো রকম জোরজবরদস্তি না করাকে বুঝায়। এ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মনে রাখতে হবে, এই সমুদয় মধ্যপন্থা ও উদারতাই শরীয়তের বিধানভুক্ত ও অঙ্গস্বরূপ। কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত ও অভিষ্ট মধ্যপন্থার নামে ইসলামে কাটছাঁট করা, মিথ্যাচারের নামে ফরয-ওয়াজিব থেকে অব্যাহতি লাভ, বন্ধুত্বের খাতিরে জিহাদ থেকে পিছুটান, উদারতার নামে কুফরী ও জুলুমের সাথে আপোষ করা এগুলি ইসলাম নয়। এগুলি হচ্ছে ইসলামের বিপরীত কর্ম এবং ইসলাম থেকে পলায়নের পথ। অন্যদেরকে খুশী করার নিমিত্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর আহকাম ও বিধি-বিধান পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি খরিদ করার পথ এবং তাঁর শাস্তিকে আহ্বান করার কারণ হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যাকে প্রশংসিত ও কাংখিত সাব্যস্ত করেছেন তাই আমাদের জন্য প্রশংসিত ও কাংখিত এবং তাঁরা যাকে অপছন্দ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকাই আমাদের মধ্যপন্থা ও উদারতা। কেননা ইসলাম তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনেরই অপর নাম।

www.pathagar.com

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. (سورة البقرة)

"যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়" (সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)।

ইসলামের ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর মধ্যে প্রভূত স্বাধীনতা বিদ্যমান। কিন্তু এই স্বাধীনতা তার অবকাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অবকাঠামোকে ভাঙ্গা, তা থেকে পলায়ন করা কিংবা তার বাইরে স্বাধীনতা তালাশ করা ইসলামের পরিপন্থী। একথাই আল্লামা ইকবাল তাঁর এক কবিতায় এভাবে বলেছেন :

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مؤمن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

"কাফেরের পরিচয় হলো দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া, মুমিনের মধ্যে হারায় নিসীম দিগন্ত।"

দ্বীনকে সব রকম জোড়াতালি থেকে রক্ষা করতে হবে, অন্যদের দাবি পূরণ কিংবা তাদের খুশী করার জন্য দ্বীনের মধ্যে কাটছাঁট করা আল্লাহ্‌র আনুগত্য নয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারই শামিল। দেখুন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে কি বলছেন :

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (المؤمن ٤٠ : ٦٦)

"বলো, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি একাজ কিভাবে করতে পারি যখন আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে! আর আমি আদিষ্ট হয়েছি রব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করতে" (সূরা মুমিন : আয়াত ৬৬)।

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لاَّ اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (النعام ٦ : ٥٦)

www.pathagar.com

"বলো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান করো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না" (সূরা আনআম : আয়াত ৫৬)।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ وَاقٍ (الرعد ١٣ : ٣٧)

"এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়। তোমার কাছে যে জ্ঞান এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তোমার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ তোমাকে রক্ষাও করতে পারবে না" (সূরা রা'দ : আয়াত ৩৭)।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذًا لَاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً (بنى اسرائيل ١٧ : ٧٣)

"আর হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে আমি যে ওহী পাঠিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এই লোকেরা তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টায় কসুর করেনি, যাতে তুমি আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা তৈরি করো। তবেই তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৭৩)।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (يونس ١٠ : ١٥)

"আর যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আনো এছাড়া অথবা একে বদলাও'। বলো, নিজ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই আমি মহাদিবসের আশংকা করি" (সূরা ইউনুস : আয়াত ১৫)।

www.pathagar.com

এ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ একটি দর্পণস্বরূপ, যার মধ্যে হকপন্থীদের অবস্থান ও দৃষ্টান্ত এবং বাতিলপন্থীদের কুপ্রবৃত্তি, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই পূর্ণ ছবি অবলোকন করা যায়। সময়-কাল যতই পরিবর্তিত হোক এবং ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারী কীর্তিবানরা যতই নতুন নামে ও নতুন আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেনো, হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর মত-পথ ও রীতি-নীতি আদৌ বদলায় না। এই দর্পণে শুধু অন্যদেরই নয়, বহু দোস্ত-বন্ধুর আসল চেহারাও দর্শন করা যেতে পারে। আর এই দর্পণে আমরা অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পথের আদর্শও স্পষ্ট দেখতে পাই। আর এটাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً (الاحزاب ٣٣ : ٢-٣)

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা ওহী হয় তুমি তার অনুসরণ করো। তোমরা যা করো আল্লাহ তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর তুমি নির্ভর করো আল্লাহর উপর এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট" (সূরা আহযাব: আয়াত ২-৩)।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ (الجاثيه ٤٥ : ١٨-٣٠)

"এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট বিধানের উপর। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু। এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত" (সূরা জাছিয়া : আয়াত ১৮-২০)।

অবিচলতা আমাদের কর্মকৌশলের প্রথম ভিত্তি। আর এর দাবি হচ্ছে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থল সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতা থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতাও দেখানো যাবে না। লক্ষ্য সর্বাবস্থায় সুস্পষ্ট হতে হবে, কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও আলো-আঁধারীর অবকাশ থাকবে না। এর

www.pathagar.com

উপর অটল থাকা, আল্লাহ্‌র রজ্জু আঁকড়ে ধরা, একমাত্র তাঁর শক্তির উপর ভরসা করা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন অবস্থানে অটল থাকা ঈমানদারের নীতি ও বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যেই তার স্থায়িত্ব ও ইহ-পরকালীন সাফল্য নিহিত।

## কর্মকৌশল

দৃঢ়তা ও অবিচলতা যদি এই কর্মকৌশলের প্রথম ভিত্তি হয়ে থাকে, তবে এর দ্বিতীয় ভিত্তি এবং একই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা। অবিচলতা কোনো অন্ধ বধিরতার নাম নয়। অবিচলতার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পূর্ণ বিচার-বিবেচনা সহকারে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনা করা। উদ্দেশ্যের সঠিক উপলব্ধি, কর্মতৎপরতার পূর্ণ জ্ঞান, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরিকল্পনা তৈরি, উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হাসিল করার কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণ এবং গন্তব্যে পৌঁছার পর যত রকমের দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলির পুরোপুরি জ্ঞান এবং কার্যত সেগুলো লাভ করে ও যথাসময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই হবে এক্ষেত্রে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূল চাবিকাঠি। কুরআন পাকের অধ্যয়ন এবং মহানবীর মহান সীরাতের উপর চিন্তা-ভাবনা থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, হিকমত বা কর্মকৌশল নবীর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। একই সাথে অবিচলতা ও কর্মকৌশল ভিত্তিক পথ অবলম্বন করেই ঈমানদারগণ তাদের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারে। এর মর্যাদা মানুষের দু'টি পায়ের মতো। সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য দু'টি পায়েরই প্রয়োজন। নিছক একটি পায়ের সাহায্যে মনযিলে মাকসুদে পৌঁছা যায় না।

## মধ্যপন্থা ও উদারতা

হিকমত বা কর্মকৌশলের দাবি হচ্ছে, একদিকে আমরা দ্বীনের মধ্যে কোনো কাটছাঁট করবো না এবং করতে দেবো না, বরং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে তার আসল রূপে মজবুতভাবে ধারণ করবো। অন্যদিকে আমরা কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হবো না। ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেবো না। ইসলামের শেখানো মধ্যপন্থা ও উদারতা পরিত্যাগ করবো না। নিজের আহ্বায়ক সুলভ মর্যাদার কথা ভুলবো না। আমাদের লড়াই রোগের বিরুদ্ধে, রোগীর বিরুদ্ধে নয়। কুফরের বিরুদ্ধে এবং তাও কাফেরদেরকে ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী করার জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়। আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টিরই কিছু অধিকার আছে এবং তাদেরকে দ্বীনে হকের

www.pathagar.com

দিকে নিয়ে আসার কিছু নিয়ম-পদ্ধতি আছে। সেগুলোর প্রতি সম্মান ও গুরুত্বদানই হচ্ছে দ্বীনের হিকমত ও কর্মকৌশল।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - (النحل ١٦ : ١٢٥)

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়" (সূরা নাহ্‌ল : আয়াত ১২৫)।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (ال عمران ٣ : ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১০৪)।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ (حم السجده ٤١ : ٣٣-٣٤)

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'! ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৩৩-৩৪)।

## ন্যায়নিষ্ঠা

হিকমত বা কর্মকৌশলের একটি দিক হচ্ছে, আমরা ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কখনো হাতছাড়া করবো না। এমনকি বিরোধিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়াঝাঁটি, তর্ক-বিতর্ক সর্বক্ষেত্রে আমরা ন্যায় ও ইনসাফের পথে কায়েম থাকবো। আমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে কোমলতা ও কঠোরতা, ক্ষমা ও উদারতা, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ এবং শত্রুর ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকা এবং শত্রুর

www.pathagar.com

ওপর আক্রমণ করার সকল সম্ভাব্য উপায় যথাযথ সময় ব্যবহার করবো। আ কারণেই কুরআন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে অনুগ্রহ, শাস্তি ও প্রতিশোধের সাথে ক্ষমা ও উদারতা, যুদ্ধের সাথে সন্ধি এবং শক্তি প্রয়োগের সাথে আলাপ-আলোচনা ও সন্ধিচুক্তির উল্লেখ করেছে। এগুলোর প্রতিটি নিজ নিজ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে অপরিহার্য। এগুলোর প্রতিটি অস্ত্রকে তার সঠিক সময় ব্যবহার করা এবং এ ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য রক্ষা করাকেই হিকমত, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআন এ প্রসঙ্গে আমাদের কিভাবে পথ প্রদর্শন করছে ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তা প্রণিধানযোগ্য :

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۔ (الاعراف ٧ : ٢٩)

"বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের" (সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৯)।

انَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل ١٦ : ٩٠)

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো" (সূরা নাহল : আয়াত ৯০)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ انَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائده ٥ : ٨)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন" (সূরা মাইদা : আয়াত ৮)।

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (البقرة ٢ : ١٩٤)

www.pathagar.com

"সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সাথে থাকেন" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৪)।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ
(النحل ١٧ : ١٢٦)

"যদি তোমরা প্রতিশোধ নাওই, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ নিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম" (সূরা নাহল : আয়াত ১২৬)।

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ. اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.
(الشورى ٤٢ : ٤٠-٤٣)

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ" (সূরা শূরা : আয়াত ৪০-৪৩)।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে, সে শহীদ, যে ব্যক্তি তার দীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহীদ, যে ব্যক্তি তার প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহীদ" (তিরমিযী)।

'এভাবে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শুধু প্রস্তুত থাকারই নয়, মুকাবিলার শক্তি অর্জনও অপরিহার্য করেছেন। আর সেজন্য অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ. (انفال ٨ : ٦٠)

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে এর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (সূরা আনফাল : আয়াত ৬০)।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (انفال ٨ :٦٢-٦١)

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন" (সূরা আনফাল: আয়াত ৬১-৬২)।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আচার-ব্যবহারে ক্রোধ ও উত্তেজনা পরিহারের শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। যখন মুমিন ক্রুদ্ধ হয় তখন সে ক্ষমা করে দেয় :

وَاِذَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ. (الشورى ٤٢ : ٣٧)

"এবং ক্রোধাবিষ্ট হলে তারা ক্ষমা করে দেয়" (সূরা শূরা :আয়াত ৩৭)।

কেননা, মুমিন ব্যক্তি তার ক্রোধকে সংবরণকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী হয়ে থাকে :

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ . (ال عمران ٣ : ١٣٤)

"এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৩৪)।

www.pathagar.com

আল্লামা কুরতুবী, ইমাম রাযী ও আল্লামা ইবনুল আরাবী মালিকী অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, ক্ষমা ও মার্জনার পরিণতিতে যদি ফিতনা দমিত হয় এবং ভ্রষ্টরা তাদের অপকর্ম থেকে বিরত থাকে, তবে ক্ষমা পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি ক্ষমা ও মার্জনার দরুন অপরাধীর দু:সাহস বৃদ্ধি পায় এবং তার ক্রোধ আরো শক্তিশালী হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণই যথার্থ কাজ। আর এসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করাকেই হিকমত বা কর্মকৌশল বলা হয়।

## আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

কর্মকৌশলেরই আরেকটি দিক হচ্ছে কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ। আর তাও বিশুদ্ধ বাক্যের সাথে সাথে মিষ্টি-মধুর কথার মাধ্যমে :

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرة ٢ : ٨٣)

"এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে" (সূরা বাকারা : আয়াত ৮৩)।

কেননা, আল্লাহ তাআলার শিক্ষাই হচ্ছে :

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (بنى اسرائيل ١٧ : ٥٣)

"আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলো" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৫৩)।

আর সংলাপেরও নিয়ম হচ্ছে যৌথ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা :

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (ال عمران ٣ : ٦٤)

"তোমরা সে কথায় এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ৬৪)।

আরো বলা হয়েছে :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ- (النحل ١٦ : ١٢٥)

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল : আয়াত ১২৫)।

www.pathagar.com

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ (حم السجدة ٤١ : ٣٤)

"ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা" (সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত ৩৪)।

এগুলো হিকমত বা কর্মকৌশলেরই বিভিন্ন দিক। অনুরূপভাবে কখনও শক্তি প্রয়োগ কাঙ্ক্ষিত, কখনও হাত গুটিয়ে নেয়া উত্তম এবং তার ব্যবহারও একটি হিকমতই। মক্কী জীবন ও মাদানী জীবন একটি অভিন্ন একক। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি কখন প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ভর করছে উচ্চতর হিকমতের উপর।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ اَخَّرْتَنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً. اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ. (النساء : ٤ : ٧٧-٧٨)

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ করো, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও ? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মতো অথবা তদপেক্ষা অধিক এবং বলতে লাগলো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে ? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না ? বলো, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই" (সূরা নিসা : আয়াত ৭৭-৭৮)।

বস্তুত হিকমত বা কর্মকৌশল এতো বিভিন্নমুখী যে, তা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। আমরা কেবলমাত্র কয়েকটি ইঙ্গিত প্রদান করেছি এবং যাকিছু বলেছি দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছি। যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দৃঢ়তা ও কর্মকৌশল একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো একটিকেও উপেক্ষা করা চলে না। আর উভয়ের পরিসরের মধ্যে যে প্রশস্ততা ও বৈচিত্র্য

www.pathagar.com

রয়েছে তা আয়ত্ত করাও আবশ্যক। কিন্তু ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দৃঢ়তা ও কর্মকৌশলই সেই পথ, যার উপর যুগপৎভাবে চলে আমরা আজো ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তের সাফল্যের সাথে মুকাবিলা করতে পারি। আপোশ ও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা যেমন মৃত্যুবরণের পথ, অনুরূপভাবে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে উপযুক্ত প্রস্তুতি ব্যতিরেকে উত্তেজনা ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করাও সুষ্ঠু ও সঠিক পথ নয়। 'মডারেট ইসলামের' নামে ইসলাম থেকে বিদ্রোহ করা, বাতিল শক্তির সাথে আপোশ করা কিংবা সত্যপথ থেকে পলায়ন করার পথ অবলম্বন করা দুনিয়া এবং দ্বীন উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এই আক্রমণের মুকাবিলাও ইসলাম প্রদর্শিত মধ্যপন্থা এবং ন্যায় ও ইনসাফের উপর অটল থেকেই করা যায়। এটাই সেই পথ যে পথ অবলম্বন করে আমাদের যথার্থ পথপ্রদর্শক নবী করীম (স) ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন এবং এ পথ অনুসরণ করে আজো আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করতে পারি।

এখন মুসলিম জাতির বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম দেশগুলোর কর্ণধারদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, উপরোক্ত কুরআনী ভিত্তি ও পথনির্দেশসমূহের আলোকে সময়ের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার জন্য কি কর্মকৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে ? এই কর্মকৌশলের আলোকে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় ? যাতে মুসলিম জাতি তাদের সঠিক অবস্থান লাভ করতে পারে এবং বিশ্বকেও নব্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা যায়।

এজন্য জরুরী হচ্ছে, সর্বপ্রথম নিজ ঘর সংশোধনের পরিকল্পনা তৈরি করা। সেই নীতিমালাও নির্ধারণ করা আবশ্যক, যার ভিত্তিতে বিশ্বের অন্যান্য জাতি, বিশেষত আমেরিকার সাথে ভবিষ্যত আদান-প্রদান করা যেতে পারে। এর তিনটি অবস্থান হবে। প্রত্যেক দেশের নিজ অবস্থান, মুসলিম জাতির সম্মিলিত অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা ও তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তৈরী। নিঃসন্দেহে আমেরিকা ও তার সম্প্রসারণবাদ এই সমুদয় ব্যাপারে একটি চাবিকাঠির মর্যাদা রাখে এবং তার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত অবস্থানের প্রয়োজন। আমরা মুসলমানদের সকল চিন্তাশীল এবং বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধারদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি এ বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বক্তব্য মুসলিম জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ, মুসলমানদের বিষয়গুলোর

www.pathagar.com

দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ এবং সেইসব লোকের সামনে উপস্থাপন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছি, যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বে ও মুসলিম দেশসমূহের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন।

## তিনটি পথ

আমাদের এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলিম জাতির জন্য অসচেতনতা ও পলায়নের পথ হচ্ছে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথ। এজন্য প্রতিযোগিতা এবং পৌরুষোচিত প্রতিযোগিতাই হচ্ছে জীবন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার পথ। আমাদের একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, পরিস্থিতির সামনে আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে গোলামী ও মৃত্যু। এটা হচ্ছে সেই পথ, যার পরিণতিতে আমরা এক শত পঁচিশ কোটি লোক সমন্বিত উম্মাত হওয়া সত্ত্বেও খড়-কুটার চেয়ে বেশী গুরুত্ববহ হবো না এবং পরিশেষে একটি নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর খপ্পর থেকে বাঁচতে পারবো না। এ পথ যে জাতিই অবলম্বন করেছে, তারা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে, শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়েছে এবং কখনো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিন্তু কার্যত এই ধ্বংসাত্মক পথই অবলম্বন করেছে। কিছু সংখ্যক তো রীতিমত শয়তানী শক্তির সহকর্মী হয়ে গেছে আর কিছু সংখ্যককে নীরব দর্শক কিংবা তাদের সহজ গ্রাসে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখা যাচ্ছে। এটা মূলত মানসিক, চিন্তাগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে অস্ত্র সমর্পণেরই নামান্তর। এটা হচ্ছে শত্রুর রঙ্গে রঙীন হওয়া, দেহ রক্ষার কাল্পনিক আশায় ঈমান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও জীবন-চিন্তা পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া। তুরস্কে 'কামালবাদ' এই পথই অবলম্বন করেছিল। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদেরকে আজো ধর্মনিরপেক্ষতা ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু এখানে এটা জেনে রাখা উচিত যে, এপথ কেবল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মৃত্যুর পথই নয়, সাংস্কৃতিক মৃত্যুর পথও বটে।

দ্বিতীয় পথ এই যে, শয়তানী শক্তির সহকর্মী না হওয়া, তাদের সহজ খোরাক না হওয়া এবং নিজেকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে চলা। এ পথকে আত্মরক্ষার কর্মকৌশল বলা হয়। এক শ্রেণীর লোক পশ্চিমা জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রথম যুগেও এই কর্মকৌশল অনুসরণ করে দেখেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ থেকে আমরা কোনো উপদেশ গ্রহণ করিনি। এ

www.pathagar.com

কর্মকৌশলটি অস্ত্র সমর্পণের (সারেন্ডার) নীতি থেকে কিছুটা ভালো। এই কর্মপন্থায় নিজকে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায় আবদ্ধ করে তাবলীগী তৎপরতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তো করা যায়, কিন্তু এই কৌশলটিও যথেষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক নয়। এতে ভয়ভীতির মুকাবিলা করার যোগ্যতা স্তিমিত হয়ে যায় এবং শেষে পরাজয় ও গোলামী এই জাতিগুলোর বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় পথ হচ্ছে সংঘাত ও প্রতিশোধের পথ। ভাবাবেগে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো। জানের বাজি লাগাও। ভেঙ্গে দাও, উড়িয়ে দাও। জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। আর যে জিনিসের উপর আক্রমণ করতে পারো, আক্রমণ করো। এটাও কোনো বিচক্ষণতার পথ নয়। আর না এটাকে কোনো দিক দিয়ে আদর্শ আখ্যা দেয়া যায়। আবেগের একটি গুরুত্ব আছে। কিন্তু আবেগের সাথে সাথে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনারও প্রয়োজন আছে।

কুরআন ও আল্লাহ্‌র রাসূল (স) যে কর্মপন্থা দিয়েছেন, তা হচ্ছে দৃঢ়তার সাথে কৌশল গ্রহণ করা। তাতে শক্তি প্রয়োগ একটি আবশ্যকীয় উপাদান হলেও শক্তির বেধড়ক ও নিশ্চিন্ত ব্যবহার কিংবা নিছক অন্ধ প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের কোনো স্থান নেই। তাতে শক্তিকে হিকমতের সাথে ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। আবেগের স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রস্তুতি ও সঠিক কর্মকৌশল এবং উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ব্যতিরেকে যুদ্ধ করা বোকামি ও আত্মহননের শামিল।

কি কারণে নবী করীম (স) তেরোটি বছর পর্যন্ত মক্কায় তাঁর দাওয়াত ও তাঁর আদর্শের উপর কায়েম থেকে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন, দাওয়াতের নতুন নতুন পথ বের করেছেন, কিন্তু সেনা অভিযান পরিচালনা করেননি? তিনি মদীনায় এসেও তৎক্ষণাৎ সামরিক অভিযান পরিচালনা শুরু করেননি, বরং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নিজ কর্মশক্তিকে সুসংহত ও সুসংগঠিত করেন। শত্রুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করেননি, নিজ সংঘবদ্ধ ঐক্যকে মদীনা চুক্তির আকারে মযবুত করেন। প্রতিবেশী ইহুদীদের সাথে কাজ-কারবার ঠিক করেন। আর যখন যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয়, তখন তার বীরোচিত মুকাবিলা করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ঐ নিশ্চিত ভরসার সাথে সাথে তিনি পার্থিব প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন। যেমন নবী করীম (স) বলেন : "আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো কিন্তু উট বেঁধে রাখো।" উট যদি বাঁধা না হয়, তদবীর এবং হিকমত অবলম্বন করা না হয়, তবে নিছক তাওয়াক্কুল ভিত্তিক কোনো প্রক্রিয়াকে ইসলামী প্রক্রিয়া বলা যায় না। যদিও নিছক আবেগ তাড়িত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু একটা করে ফেলা এটাও একটা পথ বটে। কিন্তু এ পথে কল্যাণের সম্ভাবনা

www.pathagar.com

খুবই ক্ষীণ। অবশ্য ক্ষতি ও বহু বছরের পরিশ্রমের ফল নষ্ট হওয়ার আশংকা সুবিপুল।

## আসল এবং বাস্তব লক্ষ্যস্থল

আমি যতই চিন্তা-ভাবনা করি ততই অনুভব করি যে, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম উম্মাহ কম-বেশি সেই একই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমাদের সামনে ছিল। নিঃসন্দেহে বিগত পঞ্চাশ বছরে আমরা অনেক কিছু আয়ত্ত করেছি। কিন্তু পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এবং অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের সমাহার ঘটা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় তেমনি এক সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি যেমনিভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশে আমাদেরকে তার নির্মম শিকার হতে হয়েছিল। এই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র কিছু বান্দা মুসলিম জাতির জাগৃতি এবং তাদেরকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ নেন এবং পরিস্থিতির সাথে আপোশ না করে দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার সাথে চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার পথ অবলম্বন করেন। জামালুদ্দীন আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহু, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, আমীর শাকীব আরসালান, সাঈদ নূরসী, হাসানুল বান্না শহীদ এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী নিজ নিজ সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পরিবেশের আলোকে এক জীবনদায়ক কর্মসূচী তৈরি করেন এবং জাতিকে এই কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানান। আজকেও এই সমুদয় অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা এবং নতুনভাবে সুসংগঠিত হওয়ার কর্মকৌশল তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে আসল লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং এরপর ঐ লক্ষ্য হাসিলের জন্য দেখতে হবে কোন কোন বিষয়ের উপর কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী ঃ

**(১) মূল লক্ষ্য নির্ধারণ :** আমাদের দৃষ্টিতে মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ঈমান, চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্য থেকে আমাদের বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত না হওয়া। আমাদের ঈমান যে জিনিসটি দাবি করছে তা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষেত্রে নবী পাক (স)-এর পবিত্র সুন্নাহ আমাদের পথ ও আশ্রয়স্থান। এই পথনির্দেশনার উৎস থেকে আলো সংগ্রহ করে আমাদেরকে জীবনচিত্র অংকন করতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজেদের পরিচয় সংরক্ষণ করা।

www.pathagar.com

আমাদের পরিচয় যদি আহত বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আমরা বলবো, বৈষয়িক উন্নতি ও শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রথম জিনিস হচ্ছে ইসলামী পরিচয় ও তা সংরক্ষণ। এ কর্মকৌশলের মধ্যে আমাদের প্রথম টার্গেট ও লক্ষ্য হচ্ছে নিজ বিশ্বাস, নিজ ঈমান, নিজ পরিচয় ও নিজ মনযিল ও অভিষ্ট সংরক্ষণ। এ ব্যাপারে কোনো আপোষ হতে পারে না।

**(২) শক্তি সঞ্চয় :** শক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের এই বিশ্বাসকে সঠিকভাবে অর্জন করতে পারবো। এটা নিছক চক্ষু বন্ধ করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বিষয় নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক শক্তি এবং বৈষয়িক ও সামরিক শক্তি অর্জনও মনযিলে মকসুদে পৌঁছার জন্য একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। কুরআন আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করা, অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখা এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার যে নির্দেশ দিয়েছে, আমাদেরকে তা বুঝতে হবে এবং তাকে আমাদের কর্মকৌশলের মধ্যে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দান করতে হবে।

**(৩) জাতির ঐক্য :** বাহ্যত এটি একটি দুরূহ কাজ মনে হয়। কিন্তু ঐক্য ও শক্তি সংহত করা অত্যধিক প্রয়োজন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিপদের এই সয়লাব মুকাবিলা করা কঠিন। টিকে থাকার একটিই পথ, আর তা হচ্ছে সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শক্তিসমূহের ঐক্য প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। শুধু দ্বীন ও আপন তাহজীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির স্থায়িত্বের জন্যই নয়, বরং আপন পার্থিব স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের জন্যও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। অন্যথায় কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই টিকে থাকবে না।

এই নীতিগত কিন্তু কার্যত সিদ্ধান্তকরী ভিত্তিগুলো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার পর আমরা অভিষ্ট কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরতে চাই। কিন্তু তার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় আরেকবার পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা দরকার। কেননা এ দু'টির উপরই সমস্ত তাত্ত্বিক ও বাস্তব কর্মকৌশলের সাফল্য নির্ভরশীল।

## উম্মতের আহ্বানকারী

প্রথমেই আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে দাওয়াত দানকারী একটি উম্মত। মুকাবিলার জন্য শক্তি যাই থাক এবং

www.pathagar.com

মুকাবিলার সময় যাই হোক, আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু শত্রুর ধ্বংসসাধন নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার সংশোধন ও কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে, চাই তারা যেখানেই থাকুক এবং যে ব্যবস্থাধীনই থাকুক, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। মুকাবিলা, লড়াই ও যুদ্ধের সময় আমাদের উদ্দেশ্য বিপক্ষের ধ্বংসসাধন নয়, তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করাই উদ্দেশ্য।

এজন্যই আজ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী সংকল্প, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামরিক তৎপরতার মুকাবিলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকান জনগণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর আজকের সমাজের যে কাঠামো, তাতে আমেরিকা নিছক সেখানকার বর্তমান নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার নাম নয়। স্বয়ং সে সমাজে বিভিন্ন শক্তি তৎপর রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুটো বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিক দাওয়াত দানকারী একটি উম্মত হিসাবে এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী একটি জাতি হিসাবে আমাদের কোনো আবেগী কিংবা একরোখা নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। এজন্য সংলাপের পথ সর্বদা খোলা থাকা চাই এবং অনাচার বিকৃতিকে সীমিত করার জন্য যেখান থেকেই আমরা সাহায্যকারী পেতে পারি, তার জন্য আমাদেরকে সেই পরিমাণ চিন্তা করতে হবে যতটুকু চিন্তা করবো আমাদের বাস্তব প্রতিরক্ষার জন্য। প্রতিটি সমাজে কিছু উত্তম জিনিসও দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রতিটি দেশে কিছু ভালো লোকও বিদ্যমান থাকে। এজন্য মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষা ও সামরিক উভয় কর্মকৌশলেরও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত এবং ব্যাপক ধ্বংসসাধন কখনো আমাদের নীতি হতে পারে না। কোথাও শুধু নিকৃষ্টতার অস্তিত্ব নেই এবং কল্যাণ যেখানেই থাকুক এবং যে পর্যায়েই থাকুক তাকে আমাদের আপন সম্পদ বানাতে হবে।

নবী আকরাম (স)-এর রাজনৈতিক কর্মকৌশলে, সামরিক কর্মকাণ্ডে ও দৌত্যকর্মে আমরা মুকাবিলা এবং পারস্পারিক মতবিনিময়ের একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখতে পাই। তা আজো আমাদের কর্মকৌশলের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

## বহুমুখী কর্মকৌশল

দ্বিতীয় নীতিগত বিষয় এই যে, আমেরিকা যেভাবে আজ তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, তাও কোনো একমুখী (one dimensional) যুদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে তার সামরিক শক্তি ও ফৌজী আধিপত্য এই যুদ্ধ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বহন করে। আজ আমেরিকার সামরিক শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে বেশী এবং এ কারণেই সে যে দেশের উপর ইচ্ছা চড়াও হয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত। সে একটির পর একটি দেশকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর পরিকল্পনা তৈরি করছে এবং জাতিসংঘকেও নিজের ক্রীতদাসের চেয়ে অধিক মর্যাদা দেয় না। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা মস্তবড় ভুল হবে যে, এ যুদ্ধ নিছক একটি সামরিক অভিযান। নব্য সাম্রাজ্যবাদের অপর দিক—চিন্তাগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচার মাধ্যমের দিকও একই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার সমতুল্য। এগুলোর মুকাবিলার কর্মকৌশলও বহুমুখী (Multi-dimensional) হওয়া উচিত। অন্যথায় যে আগ্রাসনের কবলে আমরা আছি তার মুকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

আমাদের কর্মকৌশলের মধ্যে এই উভয় দিকের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখা আবশ্যক। আমাদের দৃষ্টিতে সমস্ত মুসলিম দেশ ও মুসলিম উম্মাহ্‌কে আজ যে কর্মকৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন, তার তিনটি দিক রয়েছেঃ (১) চিন্তাগত ও নৈতিক, (২) সাংগঠনিক ও কাঠামোগত এবং (৩) প্রয়োগগত (operational)। আমরা এই তিনটি দিক সম্পর্কেই কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করবো।

**(১) চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তি ঃ** আমাদের কর্মকৌশলের ভিত্তি নিছক স্বার্থ ও সাময়িক সুবিধালাভ হতে পারে না। দেশের স্বার্থ, উম্মতের স্বার্থ, বরং মানবতার স্বার্থ নিঃসন্দেহে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাময়িক সুবিধা লাভের প্রতি কেবল সেই ব্যক্তিই দৃষ্টিপাত করতে পারে যার পায়ের নিচে মাটি নেই। কিন্তু কোনো মুসলমান, কোনো মুসলিম রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য তাদের কর্মকৌশলের ভিত্তি হবে তাদের ঈমান, দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য এবং নৈতিক যোগ্যতা। এজন্য আমরা যে পথই অবলম্বন করি এবং যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করি, তার মধ্যে সর্বাগ্রে থাকতে হবে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার উপলব্ধি এবং সর্বোত্তম জাতি হিসাবে আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার উপলব্ধি।

**১. আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা :** মুসলিম অস্তিত্ব বজায় রাখার এবং তাকে পুনর্জীবিত করার জন্য যে কর্মকৌশলই তৈরি করা হবে, তার প্রথম দফা হবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া। আল্লামা ইকবাল মরহুম অত্যন্ত মূল্যবান কথা

www.pathagar.com

বলেছেন, "ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই গোটা ইতিহাসে মুসলমানরা ইসলামকে বাঁচায়নি, বরং ইসলাম মুসলমানদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।" পার্থিব শক্তি, চৈন্তিক আন্দোলন, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি সবই প্রয়োজন, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং ইসলামের রজ্জু মজবুতভাবে ধারণ করা। সূচনাবিন্দু একটি এবং শুধু একটিই :

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(البقرة ٢: ١٥٦)

"যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৬)।

আর বাস্তবতাও এটাই যে,

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (ال عمران ٣ : ١٦٠)

"আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর মুমিনগণ যেন আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করে" (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৬০)।

**২. আত্মসংশোধন :** উম্মতের উন্নতির কোনো পথ নিছক উপায়-উপকরণের প্রাচুর্যের দ্বারা নির্মিত হতে পারে না। এটা কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। এর মধ্যে মূল ক্রিয়াশক্তি হচ্ছে মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী। তাদের অবস্থা অট্টালিকা নির্মাণে ব্যবহৃত ইটের ন্যায়। এ ইট যদি খারাপ ও কমজোর হয়, তাহলে ইমারত মযবুত হবে কিভাবে?

ব্যক্তিসত্তার চিন্তা এ অর্থে নয় যে, আমরা বলিষ্ঠ ও সুঠামদেহী হয়ে যাবো এবং ধনবান হবো। নিঃসন্দেহে সুস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আসল শক্তি হচ্ছে সুদৃঢ় ঈমান ও মযবুত নৈতিক শক্তি। ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই এ উম্মতের প্রত্যেক সদস্য উম্মতের শক্তির উৎস হতে পারে। অতঃপর এ দলটি এমন একটি দলে পরিণত হতে পারে যা লোহার গোলার ন্যায় হবে। কেউ আপনাকে চিবাতে পারবে না এবং চিবানোর চেষ্টা করলে তার দাঁত ভেঙ্গে যাবে।

www.pathagar.com

**৩. আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত :** আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াতদানই উম্মতকে জাগ্রত ও কর্মতৎপর করার মাধ্যম হতে পারে। এই দাওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য লোকদের কাছে একটি নতুন বার্তার পতাকাবাহী হয়ে পৌঁছতে পারি। এই পথ অবলম্বন করে উম্মতের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রচলন হতে পারে এবং সমাজিক সংশোধন হতে পারে। এর দ্বারা শিক্ষাগত উন্নয়নের স্রোত প্রবাহিত হয়। সমাজকে তৎপর ও প্রস্তুত করা ব্যতিরেকে মুসলমানগণ সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলাও করতে পারে না। পরিবার ও সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে হলে তা দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকে কেন্দ্র করেই করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তা অনুধাবন করা, তদনুসারে আমল করার উৎসাহ সৃষ্টি এবং নবী করীম (স)-এর জীবনী অধ্যয়ন, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগর্ত্য প্রদর্শন করা চাবিকাঠির গুরুত্ব বহন করে। একাজ বাইরে বের হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছা ব্যতিরেকে আনজাম দেয়া যায় না। কুরআন ও সীরাতে নববী থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করেছি তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জনগণের কাছে পৌঁছে যাওয়া। তাদেরকে জাগ্রত করা, তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য সকলে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা। যে পর্যন্ত আমরা সকলে দাওয়াতের এই কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ না করবো, উম্মত সেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না, যা দ্বারা তারা বাইরের বিপদ মুকাবিলা করতে পারে।

**৪. উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব :** মতভেদের ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও বহু মতের (plurality) সত্যকে উন্মুক্ত মনে মেনে নেয়া এবং উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতপার্থক্যগুলোকে সীমার মধ্যে রাখার অনুশীলন আমাদের অবশ্যই করতে হবে। মাযহাবী মতবিরোধকে কোনোক্রমেই রেষারেষি, ঠোকাঠুকি ও সংঘাতে রূপায়িত করা যাবে না। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে স্বাভাবিক মতপার্থক্য সম্মানার্হ হওয়ার উপলব্ধি অর্জন করাও জরুরী। অন্য কথায়, সহনশীলতা, পারস্পরিক উপলব্ধি ও সমঝোতা হবে আমাদের মত ও পথ। কেননা জাতীয় ঐক্য ঈমানের পর একমাত্র পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন মুসলিম নেতৃত্ব ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে মতভেদকে সীমার মধ্যে রাখতে পারবে। এজন্য আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে তিনটি জিনিস লালন করতে হবে ঃ (এক) মতভেদ সত্ত্বেও পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার,

www.pathagar.com

মানসিকতা, (দুই) পরস্পরকে উপলব্ধির বুঝাপড়ার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত আলোচনা ও ভাববিনিময়, (তিন) পারস্পরিক পরামর্শ ও উপদেশের ব্যবস্থার উজ্জীবন। পরামর্শের পরিধি কেবল নিজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পরামর্শের পরিধিকে জীবনের সকল বিভাগে প্রসারিত করতে হবে।

কর্মকৌশলের এই চারটি চিন্তাগত ও নৈতিক স্তম্ভকে অপরিহার্যরূপে বুনিয়াদী মর্যাদা দিতে হবে।

## সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডল

কর্মকৌশলের অপর পরিমণ্ডল হচ্ছে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। এর দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহকে আপন বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ দিকটিকে নিছক অন্তর্বর্তী কাল কিংবা দীর্ঘ কালের সংশোধনের নামে মন্থরতার ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা যাবে না। এসব সংশোধনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন রয়েছে এবং এক্ষেত্রে এক এক দিনের বিলম্বেও দেশ ও জাতিকে অনর্থক উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে।

**১. মত প্রকাশের স্বাধীনতা :** এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবাধিকার। এ গ্যারান্টি ইসলাম দান করেছে। নিঃশর্ত গ্যারান্টি। যে সমাজব্যবস্থা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তাশক্তির উপর তালা লাগিয়ে দেয়, মত প্রকাশ, ভাবের আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনার সুযোগ থেকে আপন ব্যক্তিদেরকে বঞ্চিত রাখে এবং প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য অবগত হতে, তা অনুধাবন করতে, তার আলোকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধা দেয়, তারা জাতির সৃজন ও নির্মাণ শক্তিকে দুর্বল ও নিঃশেষ করছে এবং অলীক মযবুতির নামে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। একারণেই সাংগঠনিক সংশোধনের ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রয়োজন।

**২. স্বজাতির উপর আস্থা স্থাপন :** দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, অন্যদের পরিবর্তে নিজ জাতির উপর আস্থা স্থাপন, তাকে কর্মপন্থা রচনায় শরীক করা, প্রকৃত পরামর্শ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন, সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা (informed debate) এবং ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের (decision making) ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা। কোনো একক ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক ভুল হবে। পরামর্শ সভা (think tanks) প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ্য আলোচনা এবং গঠনমূলক সাংগঠনিক সমালোচনার মধ্যেই আমাদের উন্নতি ও শক্তির রহস্য নিহিত।

www.pathagar.com

**৩. শিক্ষা ও প্রযুক্তি :** তৃতীয় বিষয় হচ্ছে শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং বৈষয়িক উপায়-উপকরণ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উন্নয়নই নয়, বরং প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

**৪. আত্মনির্ভরশীলতা :** চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, নীতিগতভাবে প্রতি যুগে, কিন্তু নির্ভেজাল কর্মগত দিক থেকে আজকের পৃথিবীতে বিশ্বায়নের সয়লাবের মুকাবিলা করার জন্য, যা আমাদেরকে, আমাদের জীবনযাত্রাকে ও আমাদের তাহযীবকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে, তা হচ্ছে কিছু পরিমণ্ডলে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ বণ্টন ও যোগ্যতার বহুমুখী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যহীন স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়। আর আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ দুনিয়া বিমুখ হওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনোপকরণ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও (autarky) নয়। আত্মনির্ভরশীলতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একটি জাতি তার বুনিয়াদী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত কোনো চাপের ও নিরুপায় অবস্থার মুখে নয়, বরং নিজেদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, নীতিমালা ও ন্যায়ানুগ স্বার্থের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং নিজের ভেতর এমন চৈন্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি রাখবে, যার দরুন অন্যরা তার সিদ্ধান্তসমূহের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, চাই যে আকারেই হোক, সে অন্যদেরকে দুনিয়ার মুখাপেক্ষী বানায় এবং তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। এ কারণেই গোলামী হচ্ছে ব্যক্তিত্বহীনতার নামান্তর। ইতিহাসের শিক্ষাও এই যে, যে জাতি তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না এবং তার অস্তিত্বকে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে, সে কখনো মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। মুসলিম উম্মাহকেও যমীন ও আসমানের স্রষ্টা যে মিশন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা হচ্ছে "শুহাদা আলান-নাস" (মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ)। এই মূল্যবোধ এবং অন্যদের দ্বারা শাসিত হওয়া বা অন্যদের মুখাপেক্ষী হওয়া একই সাথে একত্র হতে পারে না।

## ঐক্যবদ্ধ কর্মকৌশল গ্রহণ আবশ্যক

যদি এই উম্মতই মানসিক, চিন্তাগত, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়,

www.pathagar.com

তাহলে এরা তাদের স্বাতন্ত্র্য কিভাবে বজায় রাখতে পারে এবং নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কিভাবে পালন করতে পারে? আজ গোটা দুনিয়া, বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যে বিপদের সম্মুখীন, তার মুকাবিলা করার জন্য যদি তারা সকলে একত্র না হয় এবং মিলেমিশে একে অপরের সহায়ক না হয়, তবে আল্লাহ্ না করুন, এক এক করে সকলেরই নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আজ যদি ইরাক লক্ষ্যবস্তু হয় (নিবন্ধটি ইরাক আক্রমণের পূর্বে লেখা), তবে কাল লক্ষ্যবস্তু হবে ইরান। পরশু পাকিস্তান, সিরিয়া, সউদী আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও তুরস্ক। এটা নিছক কল্পনামাত্র নয়, আজকের পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক (geo-political) অবস্থার উপর দৃষ্টিপাতকারী প্রত্যেক ব্যক্তি এই যুদ্ধের পরিকল্পনাকে চাক্ষুষভাবে দেখতে পাচ্ছে। বরং এইরূপ লক্ষ্যবস্তু বানানো শুরু হয়ে গেছে। আর আমেরিকায় যে ২৫টি দেশের অধিবাসীদের সাথে বিশেষ আচরণ বিধির ডাণ্ডার প্রয়োগ জোরেশোরে শুরু হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ২৪টিই হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্র। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে এমন একটি দেশ, যে নিজকে আমেরিকার মিত্র এবং ঐতিহাসিকভাবে বন্ধু বলে মনে করে। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিছক ইরাকের বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনাবিন্দু এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ। সম্প্রতি ১২ জানুয়ারি, ২০০৩ খৃ. ওয়াশিংটন পোস্টে প্রেসিডেন্ট বুশের দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি অতি গোপনীয় (top secret) দলীল প্রকাশিত হয়েছে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত ঘটনার মাত্র ৬ দিন পর অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর লিখিত হয়েছিল। তাতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশনার সাথে পেন্টাগনের জন্য এ নির্দেশাবলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : To begin planning military operations for an invasion of Iraq. "ইরাকের উপর হামলা করার জন্য সামরিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরি শুরু করা।"

এরপর ১৭ জানুয়ারি, ২০০৩ খৃ.-এর ঐ ওয়াশিংটন পোস্টে এ কথাও লেখা হয় যে, ইরাকের নামকাওয়াস্তে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসমূহ কবজা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ইরাকে সম্পূর্ণভাবে সামরিক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান দখলের মতো আমেরিকান বাহিনীর বর্তমান সার্ভিস জেনারেলের অধীন সামরিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশ পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ও প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তান ও ইরাকের সাথে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ খৃ.-এর ঘটনার সম্পর্ক এবং ইরান, পাকিস্তান ও সউদী আরবের সাথে ইরাকের সম্পর্ক

www.pathagar.com

(linkage) অনুধাবন করতে অক্ষম এবং তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত আছেন যে, "অন্যের জন্য কিসের চিন্তা, নিজের পরিণতি আগে ভাবো।" আমাদের এই স্বপ্ননিদ্রা থেকে এখন জাগ্রত হতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে যে, আত্মনির্ভরতা ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ছাড়া অন্য কোনো পথ কারো জন্যই বাঁচার পথ নয়। আমরা সংঘবদ্ধভাবে একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারি এবং পৃথক পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে সকলেই খতম হয়ে যাবো। আর খোদা না করুন, হবে তাই, যে পরিণতি হয়েছিল এক শত বছর পূর্বে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের হাতে অথবা উত্তর আরব, হিজাযী ও ইয়ামানী আরবদের পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের পরিণতিতে সাত শত বছর পূর্বে মুসলিম স্পেনের।

দীন, ঈমান, চিন্তাধারা ও তাহযীব-তমদ্দুনের দাবি অনুযায়ী এই ঐক্যের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু আজ তো এটা পারস্পরিক অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা, নিজেদের বিষয়াবলী ও উপায়-উপকরণগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষার শক্তি সৃষ্টি করার মধ্যেই মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের স্বার্থ নিহিত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ মুহূর্তে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ১.৩ ট্রিলিয়ন অর্থাৎ এক হাজার তিন শত কোটি ডলারের পুঁজি আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে বিনিয়োগ করা রয়েছে। আর এই অর্থ আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে ফেরত আনাও ক্রমশ দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। এই অর্থের অর্ধেকও যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটি অর্থনৈতিক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে পারে। যে দেশ ও বক্তিবর্গ এই অর্থের মালিক, পাশ্চাত্যের কবল থেকে তা বের করে আনার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত।

এটা সম্ভব নয় যে, আপনি আপনার গর্দান ঐসব দেশের হাতে ন্যস্ত করবেন, তারপরও নিজ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বপ্নও দেখবেন। পরিস্থিতি আমাদেরকে এ স্থানে নিয়ে এসেছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অর্থনৈতিক, ধনগত, শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক, সামরিক, মোটকথা এ সমুদয় ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া এসব দেশের স্বাধীন থাকা এবং কোনো ইতিবাচক আন্তর্জাতিক কর্ম সম্পাদন করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা উত্তমরূপে অনুধাবন করতে হবে যে, তাত্ত্বিক ও নীতিগত ভিত্তিতে একটি মযবুত অর্থনীতি, বৈষয়িক উপায়-উপকরণ লাভ, প্রযুক্তির ময়দানে প্রতিযোগিতার

www.pathagar.com

পারদর্শিতা অর্জন এবং সামরিক দিক থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষা কার্যকরভাবে নিজেরাই সম্পন্ন করার মতো শক্তি সঞ্চয় করা গোটা উম্মতের একটি সম্মিলিত প্রয়োজন। উপায়-উপকরণ মওজুদ আছে। সম্ভাবনার কমতি নেই। কমতি আছে বিশ্বাসের, পরিকল্পনা তৈরীর। নিজস্ব উপায়-উপকরণের সঠিক ব্যবহারের, সমঝদার ও যোগ্য নেতৃত্বের, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, এখন পথ (options) কমতে শুরু করেছে এবং মুসলমানদের ঐক্য, মুসলিম জনতার জাগৃতি এবং উম্মতের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তির উন্নয়ন ঘটানো ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো পথ নেই।

আমাদের ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এসব মৌলিক পরিবর্তন ও সাংগঠনিক সংশোধন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অনতিবিলম্বে এর সূচনা হওয়া দরকার। কিন্তু এর পূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হতে একটা সময়ের প্রয়োজন হবে। তাৎক্ষণিক সহযোগিতার পথও অবলম্বন করা যায় এবং করা উচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন এই যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় (co-ordination and co-operation) মাধ্যমে শুরু করে একতা, অবিচ্ছেদ্যতা ও আত্ম-নির্ভরশীলতার দিকে যাত্রা করতে হবে। যাতে আমাদের ঐক্য কেবল ভাসা ভাসা ধরনের না হয়, বরং মুসলিম উম্মাহ তার বৈচিত্র্য বজায় রেখে একটি প্রকৃত এককে পরিণত হতে পারে। ইউরোপ যদি বহু শতাব্দীর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও একে অপরের রক্তপিপাসু হওয়া সত্ত্বেও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি একক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে, তবে মুসলিম উম্মাহ কেন পারবে না। আজো মুসলিম উম্মাহর জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ও বিশেষ স্বার্থান্বেষীরাই প্রকৃত অন্তরায়। এখন তাদের এই খোলস থেকে বেরিয়ে এসে এমন পথ অবলম্বন করা উচিত, যা উম্মাহর এবং স্বয়ং তাদের জন্যও কল্যাণকর।

মুসলিম জনগোষ্ঠী আজো প্রতিটি অভিন্ন সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করে এবং জান ও মাল দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করাকে নিজের জন্য মর্যাদাকর মনে করে। এই গণ-আবেগকে সামগ্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি বানানো আমাদের জন্য খুবই সহজ। এই সেদিনও ১৯৬৫ খৃ. যুদ্ধের সময় শুধু ইরান ও আরব দেশগুলোই নয়, ইন্দোনেশিয়াও ভারতের সাথে তার ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং নেহেরু-সুকর্ন বন্ধুত্বের ঐতিহ্য সত্ত্বেও কেবলমাত্র কূটনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, কার্যকর সামরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের পর পাকিস্তানের তেলের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সউদী আরব ও

www.pathagar.com

কুয়েত যে সাহায্য করেছে, তাও তো নিছক কাল্পনিক বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও ২০০১ সালের জানুয়ারিতে লাহোরের সুধী সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য, 'আমাদের সাহায্যে কে এগিয়ে এসেছে ?' একটি অসত্য ও বাস্তবতা বর্জিত উক্তি বই কিছু নয়।

## শক্তি প্রয়োগের সীমা

কর্মকৌশলের তৃতীয় ও তাৎক্ষণিক মনোযোগের অংশ শক্তি প্রয়োগ (operation)। এক্ষেত্রে প্রথম বিষয় হচ্ছে আমেরিকার সাথে সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা করা। আমেরিকা একটি বিশ্বশক্তি, বরং একমাত্র পরাশক্তি। এটা এমন এক সত্য যা উপেক্ষা করা যায় না। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা সংঘাত কাঙ্ক্ষিতও নয় এবং এটা কোনো পথও নয়। কিন্তু সময় এসে গেছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পৃথক পৃথকভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আমেরিকাকে এ বার্তা জানিয়ে দেয়া যে, আমরা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথ তো অবলম্বন করতে চাই, কিন্তু এমন কোনো ব্যবস্থা কখনো মেনে নিতে পারি না, যাতে একটি জাতির আধিপত্য সকলের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। উত্তর কোরিয়া সাহসী পলিসির একটি নমুনা পেশ করেছে। অথচ উত্তর কোরিয়া একটি দরিদ্র দেশ, যার জাতীয় সম্পদ দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় মাত্র চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং তেল ও খাদ্য উভয় ক্ষেত্রে বাইরের সরবরাহের মুখাপেক্ষী। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের উপায়-উপকরণ, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্পদ, রাজনৈতিক সুবিধা (Leverage) সর্বক্ষেত্রে প্রভূত কার্যকর শক্তিসম্পন্ন হতে পারে, যদি তারা ব্যক্তি স্বার্থের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সম্মিলিত শক্তি অর্জন ও পারস্পরিক কল্যাণের পথ অবলম্বন করে। এজন্য সংকল্প ও আস্থার সাথে আলোচনা ও যৌথ নিরাপত্তার জন্য অনাক্রমণের পথ একই সময় গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রতি আমেরিকা যে পঁচিশটি দেশের অধিবাসীদের সাথে স্বতন্ত্র আচরণ শুরু করেছে, সেগুলোর মধ্যে চব্বিশটিই মুসলিম দেশ। এটা এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এটি আমেরিকার সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করার একটি উপযুক্ত সূচনাবিন্দু। নিঃসন্দেহে প্রতিটি দেশের নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ করার নামে কিছু বিশেষ দেশকে লক্ষ্যস্থল বানানো জাতিসংঘ সনদ, মানবীয় সমতার মৌলিক ও সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালা এবং স্বয়ং আমেরিকার সংবিধানের প্রথম দফার পরিপন্থী। উপরন্তু এই বিধিনিষেধটি হচ্ছে বিশেষ ও

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র ধরনের। অর্থাৎ পৃথিবীর ১৯০টি দেশের মধ্য থেকে কেবলমাত্র ২৫টি দেশের বিরুদ্ধে, যারা বাহ্যত বন্ধুরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকার সাথে তাদের কোনো বৈরিতাও নেই, আন্তর্জাতিক আইনে তারা না যুদ্ধরত এবং না বৈরী ও বিরোধী (alien) শক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে এই বিধিনিষেধ শ্রেণীভিত্তিক স্বতন্ত্র আচরণের আওতায়ও পড়ে যায়। কেবলমাত্র ষোল বছর বয়সের পুরুষদের উপর এটা প্রযোজ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে গ্রীসে। অথচ সে দেশটি এই তালিকার মধ্যে শামিল হয়নি। ব্যাপারটি যদি স্বদেশত্যাগীদের এবং বিশেষভাবে বেআইনী স্বদেশত্যাগীদের হয়ে থাকে, তাহলে আমেরিকার নিজস্ব রেকর্ড সাক্ষী যে, প্রতি বছর আমেরিকায় ৩০ মিলিয়ন লোক বাইরে থেকে আগমন করে; যাদের মধ্যে দুই মিলিয়ন ফেরত যায় না। আর এদের অধিকাংশই মেক্সিকো, পুর্টোরিকা, কিউবা ও অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহ থেকে আগত। কিন্তু এরা সকলেই ঐ তালিকা বহির্ভূত। তাই রাজনৈতিক ও বিধিগত উভয় ক্ষেত্রে এই আইন ও মুসলমানদের উপর এর প্রয়োগের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক অভিযান চালানো উচিত।

অনুরূপভাবে ইরাক যুদ্ধের বিষয়টি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, ইরাক হচ্ছে একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু করার শিরোনাম মাত্র। আসল প্রশ্ন হচ্ছে নীতিমালার। আর তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদ উপেক্ষা বা লংঘন করে আমেরিকা কিংবা তার কোনো মিত্র দেশের কি এ অধিকার আছে যে, নিছক কোনো কাল্পনিক বিপদের ভিত্তিতে পূর্ব-আক্রমণের (pre-emptive strike) নামে (আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও সন্ধি আইনে যা কোনো বিষয়ই নয়) অন্য একটি সার্বভৌম দেশের উপর, যে জাতিসংঘের সদস্যও, সৈন্য পরিচালনা করতে পারে? কোনো দেশের সরকার পরিবর্তনের জন্য অপর কোনো দেশের সৈন্য পরিচালনা করা, নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা কিংবা বিদ্রোহ সংঘটিত করার কোনো বৈধতা আছে কি ? অনুরূপভাবে কোনো দেশে মারণাস্ত্র আছে এই অজুহাতে সে দেশকে যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু বানানো যায় কি ? ইরাক একটি দুর্বল দেশ। সে কারো জন্য কোনো বিপদ নয়। তবে হাঁ, তার তেলের মওজুদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মূল লক্ষ্য।

এটা এমন এক মৌলিক ইস্যু, যা আজ বিপদের সম্মুখীন। বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশেষ করে মুসলিম ও আরব রাষ্ট্রগুলো যদি নিজেদেরকে এই সামরিক অভিযান ও যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ড থেকে নিরাপদ রাখতে চায়, তবে আজ ইরাকের উপর আমেরিকার জবরদখল প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। আর এ কারণেই ২০০৩

www.pathagar.com

সালের জানুয়ারির মাঝামাঝিতে বিশ্বের ২৫টি দেশে আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বয়ং ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস ও সানফ্রান্সিসকো যুদ্ধবিরোধী ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। জার্মানি ও ফ্রান্সেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাশিয়া এবং চীনও এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শুধু ইসরাঈল ও ভারত নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী সংকল্পের কারণে বুশকে সমর্থন করছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও প্রকাশ্যে এই অহেতুক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এই হামলার প্রথম টার্গেট মুসলিম দেশগুলো চুপ করে আছে। অথচ এ সময়টি হচ্ছে জাগরণ, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বৈদেশিক নীতিকে নতুন আঙ্গিকে সমুন্নত করার। এজন্য পাকিস্তানসহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

## সংলাপের সূচনা

দ্বিতীয় তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হচ্ছে আমেরিকা ও গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে অর্থবহ আলোচনার সূচনা করা। যার মধ্যে কেবল রাষ্ট্রনায়কই নন, ঐসব দেশের সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও জনগণও শরীক থাকবেন। এজন্য প্রচার মাধ্যমের ব্যবহারও নিরতিশয় প্রয়োজন। আজ দুনিয়ার মন-মগজের উপর আমেরিকান মিডিয়া ছায়া বিস্তার করে আছে, যা স্বয়ং ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আল-জাযিরা টিভি চ্যানেলের একটি শিশু সুলভ ধ্বনি আরবজাহানে কিঞ্চিৎ অবগতি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রয়োজন এমন এক শক্তিশালী মিডিয়ার, যা হবে মুসলিম চিন্তাধারা এবং আলমে ইসলামীর আবেগ-অনুভূতি ও স্বার্থসমূহের মুখপাত্র। কিন্তু এটি না নিছক সরকারী আওয়াজ হবে এবং না প্রচারের নবতর পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ উপায়-উপকরণ আমাদের আছে। অতি সম্প্রতি পাকিস্তান নিজের স্যাটেলাইট মহাশূন্যে স্থাপন করেছে, যা উচ্চতর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমাদের কণ্ঠস্বর সমগ্র দুনিয়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। আমরা আমাদের রাজনৈতিক যুদ্ধে নিছক আমাদের কর্মহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে হেরে যাচ্ছি, যাকে ইংরেজি পরিভাষায় Loosing by default বলা হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিকার প্রয়োজন। আর এ কাজ যদি উপযুক্ত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া যায়, তবে কয়েক মাস নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হতে পারে।

আমাদের এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের সাথে সাথে পৃথিবীর সেইসব দেশ, জাতি ও দলগুলোকেও আমাদের সাথে নিতে হবে, যারা স্বাধীনতা রক্ষা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইনের সমর্থন ও

www.pathagar.com

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমাদের সহযোগী হতে পারে এবং সেজন্য নিজ নিজ পদ্ধতিতে সচেষ্ট। তাদেরকে যদি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও ব্যবহার করা যায়, তবে এই সমুদয় শক্তি এই কর্ম-প্রচেষ্টায় আমাদের সঙ্গী ও সাহায্যকারী হবে। সংলাপের এও একটি দিক যে, আমরা যেখানে রাষ্ট্রনায়কদের সাথে আলাপ-আলোচনা করবো, সেখানে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাবের আদান-প্রদানের কাজও শুরু করবো এবং এইভাবে আমরা দুনিয়াকে সবার জন্য একটি অধিক নিরাপদ ও ইনসাফমূলক আবাস বানানোর দায়িত্ব পালন করতে পারবো।

## অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

তৃতীয় প্রয়োজন হচ্ছে সংলাপের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যা দুর্বল দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক হামলা কিংবা তাদেরকে পরাভূত করার চালবাজির বিরুদ্ধে আগ্রাসন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই আমাদের দৃষ্টিতে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীলতা খতম করা, পাশ্চাত্যের সাথে কার্যকর ও অর্থবহ সংলাপ শুরু করা এবং আত্ম-নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে আগ্রাসন বন্ধের নিজস্ব শক্তির উন্মেষ ঘটানো। একাজ নীরবচ্ছিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-তৎপরতা দাবি করে। এজন্য অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং নিজেদের উপায়-উপকরণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন প্রয়োজন। আমরা হাঁটুতে ভর দিয়ে চলার মত দুর্বলও নই এবং আকস্মিক আক্রমণের বিপদ সামলানোর মতো শক্তিশালীও নই। এজন্য দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার সাথে পথ তৈরি করার মধ্যেই উম্মতের মুক্তি নিহিত। আর এজন্য যেখানে তাত্ত্বিক মযবুতি জরুরী, সেখানে বৈষয়িক শক্তি অর্জন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারও জরুরী। বিপদের সঠিক উপলব্ধি সর্বপ্রথম শর্ত। কিন্তু প্রস্তুতি ব্যতীত সংঘর্ষের পথ অবলম্বন করাও আত্মবিনাশের পথ। তাই যে পরিকল্পনাই প্রণয়ন করা হোক, তাকে পূর্ণ প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও মুমিন সুলভ অন্তরদৃষ্টি দ্বারা বিন্যস্ত করা দরকার।

## অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রাশ-প্রোগ্রাম

এ সংক্রান্ত সর্ব শেষ বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রাশ-প্রোগ্রাম গ্রহণ করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেরূপ ইউরোপে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মহা-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে এখন মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তিগত শক্তি অর্জন এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও পুঁজি সৃষ্টির (asset creation) উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। মুসলিম মূলধন নিরাপদ করারও এটাই মাধ্যম ও উপায় যে, তা মুসলিম দেশসমূহের মূলধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হবে। তুরস্কের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবাকানের উদ্যোগে ডি-৮ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এখন এই বিশ্বাসকে কার্যকর করার সময় এসেছে এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ওআইসি, ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে এসব দেশে পারস্পরিক স্বার্থ ও বন্টন কর্মের অর্থনৈতিক নীতিমালার আলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে পারে। ন্যূনপক্ষে আটটি মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে নতুন প্রযুক্তি এতো পরিমাণ মওজুদ আছে যে, তারা মুসলিম জাহানের জন্য একটি দৃঢ় ও বৃহৎ শিল্প ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব একটি বৃহৎ মার্কেট রয়েছে— যা এ শিল্প ভিত্তিকে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা দান করতে পারে। আজ এমন চিন্তাশীল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির লোকের প্রয়োজন, যা ইউরোপ গাই মোলে, দ্যা গল ও কনরাড এডিনোর-এর আকারে পেয়েছিল। এটা যে কোনো কার্যকর পরিকল্পনার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

## আমাদের নেতৃতেব্ব ঈপ্সিত ভূমিকা

পরিশেষে আমরা এও নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করছি যে, পাকিস্তান ও তার নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার এবং আমেরিকার কাছে দরখাস্ত নিবেদনের নীতি ত্যাগ করুন। তারা একটি মর্যাদাবান দেশ হিসাবে এবং আমেরিকার অতীতের ভূমিকার আলোকে নিজ বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক পলিসি পুনর্গঠন করুন। জাতির উপর আস্থা রাখুন এবং অক্টোবরের নির্বাচনের (তা যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক না কেন) ফলে প্রতিষ্ঠিত পার্লামেন্ট ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করুন। এগুলোকে মাধ্যম বানিয়ে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করা এবং দূরদর্শী পরিণামবাহী নতুন নতুন কর্মসূচি প্রণয়নের এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা চালিকাশক্তির ভূমিকা তখনই পালন করতে পারবো, যখন দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমঝোতার মাধ্যমে মৌলিক বিষয়সমূহের উপর একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পারবে। অতঃপর আমরা অন্যসব রাষ্ট্রকে এমন একটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর উপর ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করবো, যার ফলে মুসলিম বিশ্ব নিজ

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যকে সর্বতোভাবে হেফাজত করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হতে পারে, যা মানবতাকে যুদ্ধ, ধ্বংস ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠনবৃত্তির বর্তমান ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং সকলের জন্য সম্মান, স্বাধীনতা ও সুবিচারের গ্যারান্টি হতে পারে। আজ এটা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রয়োজন নয়, গোটা মানবজাতির জন্যই প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীকে আমরা শান্তি ও সুবিচারের শতাব্দী বানানোর জন্য একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে আমাদের নেতৃবৃন্দকে ব্যক্তি-স্বার্থের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহ ও মানবতার উপর আসন্ন বিপদকে দৃঢ় মনোবল ও প্রজ্ঞার সাথে মুকাবিলা করার পথ অবলম্বন করতে হবে।

*[লেখক ইউ. কে. ইসলামিক মিশনের ভূতপূর্ব পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল পলিসি স্টাডিস-এর চেয়ারম্যান, মাসিক তরজমানুল কুরআন, লাহোর-এর সম্পাদক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর ]*

অনুবাদক : **মুহাম্মদ হাসান রহমতী**

www.pathagar.com

# আমেরিকার আগ্রাসন

## মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকৌশল

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ